ট্যাক্সির মিটার উঠছে

নীলকণ্ঠ

দি নিউ বুক এম্পোরিয়ম
২২/১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র : ১৩৬৭

প্রকাশক :
অনিলচন্দ্র মজুমদার
দি নিউ বুক এম্পোরিয়ম
২২/১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

ব্লক-নির্মাতা ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
রয়াল হাফটোন কোং
৪নং সরকার বাই লেন,
কলিকাতা-৭

মুদ্রক :
সুকুমার চৌধুরী
বাণী-শ্রী প্রেস
৮৩-বি, বিবেকানন্দ রোড,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী :
শচীন্দ্র বিশ্বাস

দাম চার টাকা

শ্রীমান কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়যুক্তেষু,—

॥ নীলকণ্ঠের ॥

অন্যান্য গ্রন্থ

চিত্র ও বিচিত্র

বসন্ত কেবিন

তারা তিনজন

ননীগোপালের বিয়ে

হরেকরকমবা

জীবনরঙ্গ

অদ্য ও প্রত্যহ

অপাঠ্য

নববৃন্দাবন

একটি অশ্রু : দুটি রাত্রি ও কয়েকটি গোল

এলেবেলে

দ্বিতীয় প্রেম

সবিনয় নিবেদন—

ট্যাক্সির মিটার উঠছে'-র শেষ অংশে অর্থাৎ স্বর্ণদেব সরকার হত্যা মামলার কাহিনীটির কাঠামো আমি ফরেষ্টারের পেমেণ্ট ডেফার্ড থেকে পেয়েছি। বাঙালী লেখক হিসেবে এ ঋণ স্বীকার না করলেও চলত; কারণ অন্যের লেখা শিকার করে নিজের লেখা বলে চালানোর এই একটি জায়গায় বাঙালী লেখকদের দারুণ ঐক্য। আমি বাঙালী অনুভবে গর্বিত; লেখক বলতেও নিজেকে লজ্জা পাই না এখনও; তবে বাঙালী লেখকদের অন্যতম ভাবতে আমার এখনই খারাপ লাগে।

পেমেণ্ট ডেফার্ড থেকে আমি কাঠামোটুকুই নিয়েছি; তার বেশি নয়। এই গল্পের টুইস্ট. ফাইনার পয়েণ্টস এবং ফাইন্যাল সাপ্রাইজ,—অর্থাৎ শেষ চমকটি আমার নিজের। সে কথা না বললে আবার নিজের কাছে নিজে অকৃতজ্ঞ হতে হয়।

সতর্ক পাঠিকা [বাঙলা উপন্যাসের পাঠক আজও নেই] লক্ষ্য করবেন যে যজ্ঞেশ্বর স্ত্রীর নাম পূর্ণিমা; শশীকলা এবং শশীবালা হয়েছে। এর কারণ লেখকের অনবধানতা নয়; এর কারণ যজ্ঞেশ্বরের স্ত্রীর নাম শশীবালা যজ্ঞেশ্বরের পছন্দ না হওয়ায় সে নতুন নাম রাখে, পূর্ণিমা; তারপর কম্‌প্রোমাইস করে শশীকলা নামকরণ করে।

শশীবালা হচ্ছে থিসিস; পূর্ণিমা, এণ্টিথিসিস; শশীকলা অতএব সিন্থিসিস।

—নীলকণ্ঠ

কলাট

আজকের কথা নয়; টাকা দিলে যখন কলকাতায় বাঘের দুধ মিলত, সেই সময়ের কথা বলছি।

আজ অজস্র টাকা খরচ করলেও বাঘের দূরের কথা, গরুর দুধও পাওয়া যায় না; পাউডার মিল্ক কিনতে হয়। সেদিন লোকে মুখে বলত বটে দুধ খাচ্ছি, কিন্তু আসলে দুগ্ধ পান করত তারা। eat নয়; drink। এখন দুধ আর পেয় নয়। দুধের ক্ষেত্রে এখন চিবোন বললেও ব্যাকরণ-অসঙ্গত হয় না; গুঁড়ো দুধ যে। বরং ভাত খাচ্ছি বললে দোষ হয়; তার বদলে বলতে হয়ঃ পাথর ভাঙছি। শাস্ত্রকারেরা বলেছেন—গতস্য শোচনা নাস্তি; বলুন। কিন্তু অনুশোচনা ছাড়া আর কি আছে করবার, সেই কলকাতায় যারা বাস করেছে একদা এবং এই কলকাতায় যারা উপবাস করে আজ,—তাদের? আজও অযোধ্যা আছে, শুধু রাম নেই। কলকাতা হয়ত এখনও আছে; কিন্তু সেই আরাম কোথায়?

সে কলকাতায় সুখ ছিল। এমন কি অসুখেরও একটা কাণ্ডজ্ঞান ছিল; যথেষ্ট সময় দিত বাড়ীর লোকজনকে তৈরী হতে। এ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, কবিরাজ হাতুড়ে, টোটকা, অব্যর্থ স্বপ্নাদ্য,—সকলেরই সুবর্ণ সুযোগ ছিল রুগীর ওপর পদ্যপাঠের সেই পরামর্শ প্রয়োগ করে দেখবারঃ

'পারিব না এ কথাটি বলিও না আর,
কেন পারিব না তাহা ভাব একবার।

পাঁচজনে পারে যাহা
তুমিও পারিবে তাহা,
পার কি না পার, কর যতন আবার,
একবার না পারিলে দেখ শতবার ॥

আর এ কলকাতায়? বেঁচে সুখ নেই; এবং মরবার মুহূর্তেও নেই অসুখের নামগন্ধ। সে কলকাতায় পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে এক্কা-দোক্কায় উন্মত্ত 'ফ্রকে'র বেণী ধরে এনে বিয়ের পিঁড়িতে বসবার জন্যে শুধু বলতে হত: ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বিয়ে। এ কলকাতায় আটাশ বছরের নওজোয়ানের সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময়ে ডাক্তারের দরকার হয় না; সে নিজেই শুনতে পায় সেই অন্তিম বাক্য: উঠিসনে ছোঁড়া; তোর কবরনাবী।

সেই কলকাতায় প্রথম ফাল্গুনে দক্ষিণের হাওয়া হানা দিলে সন্ধ্যের দরজায় গাড়ীর দরকার হ'ত না; নীল আকাশের নীচে মাথাখোলা দোতলা বাসের মাথায় চেপে যেতে পকেটে কয়েক আনা পয়সা থাকলেই চলত। রকেটের দরকার হ'ত না; হাত বাড়ালে মনে হ'ত এই তো,—মুঠোর মধ্যেই চাঁদ। অবশ্য অসুবিধেও ছিল শহর থেকে দূরের যারা শহরে আসত পূজোয় কলকাতা দেখতে। কাকার সঙ্গে আসত ভাইপো। কাকা একতলায় বসত বাসে; ভাইপো উঠতো দোতলায়। উঠেই নেমে আসত। শুধু একতলায় নেমে আসত না; কাকার হাত ধরে একলাফে নামত রাস্তায়। চলন্ত বাস থেকে নামতে গিয়ে ছিটকে পড়ত। ধাতস্থ হবার পর কাকা যখন জিজ্ঞেস করত: কি হ'ল? নেমে এলি? এদিক-ওদিক তাকিয়ে ফিসফিসিয়ে বলত ভাইপো: সব্বনাশ হয়েছিল আরেকটু হ'লে। কাকার কপালে-ওঠা চোখ জানতে চাইত: কেন? ভাইপোর প্রত্যুত্তর নিরস্ত করত কাকাকে মুহূর্তে: জানো কাকা,—দোতলায় উঠে দেখি,—ড্রাইভার নেই—।

সে কলকাতায় ignorance ছিল bliss ; এ কলকাতায় নয় কেবল ; স্বাধীন ভারতের কোথাও আর Ignorance is bliss নয় ; Ignorance is Blitz now !

হরেকরকমের সুখ ছিল সে কলকাতায় ; কিন্তু সবচেয়ে সুবিধে ছিলো যে বস্তুর তার নাম যান। এখন যানের সুবিধে বেড়েছে যে পরিমাণ জানের অসুবিধে বেড়েছে তার চেয়ে কম নয়। ট্রেন, ট্রাম, বাস, গাড়ী, ঘোড়া, রিক্সা অথবা পা যে কোনও রকমই হোক না কেন যান,—জান হাতে করে তবেই তাতে চাপতে হয়। ট্রামে-বাসে ফার্ষ্ট কাব এবং লাষ্ট কাবে সমান অবস্থা ; সমান অব্যবস্থা। সমস্ত সময় ভীড়। মনে হয় দেখে দেখে বেশ কিছু লোক ট্রামে-বাসেই থাকে বুঝি সারাদিন। বাড়ীতে ফিরবেই বা কেন ? দেড়খানা খোঁয়াড়ে বাইশজন জন্তুর গরম হয়ে মড়ার মত শবদাহের অপেক্ষায় কাৎরাচ্ছে। তাই, জায়গার অভাবে কিছু লোক ট্রামে-বাসে ঝুলতে বাধ্য, আর বেশ কিছু স্ত্রীলোক শীতাতপ বিকল্পে শীততাপনিয়ন্ত্রিত ছায়াছবির প্রেক্ষাগৃহে উত্তমচিত্র অবলোকন করছে পরমানন্দে। বিজ্ঞজনদের মুখে শুনবেন : কলকাতার সিনেমায় যখন এত ভীড় তখন কে বলে এখানে দুঃখকষ্ট অন্নবস্ত্রাভাব অথবা অল্পবিত্ত এবং বিত্তনিঃস্ব মধ্যবিত্ত বলে কেউ আছে এই কলকাতায়। বিজ্ঞ নয় ; এরাই বিশেষজ্ঞ এদেশে যেদেশে বিশেষ অজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞে তফাৎ অল্পই অথবা একেবারে নেই।

সরকারী, আধাসরকারী এবং বেসরকারী এই সব বিশেষজ্ঞ হরফে বিশেষ অজ্ঞদের কেউ বলে না যে অভাবে স্বভাব কতদূর নষ্ট হ'লে তবেই যাদের কালকে খাবার কিছু নেই তারাই আজকে ছবি দেখতে যাবার জন্যে ছটফট করে। ছবিঘরে ঘণ্টা আড়ায়ের জন্যে তবুত চিন্তার হাত থেকে, পাওনাদারের লাঞ্ছনা থেকে দেড়খানা খোঁয়াড়ের দুর্ধর্ষ গরমের হাত থেকে রেহাই মেলে। আর

তেমন আন্তর্জাতিক সম্মানের উপযোগী হাইক্লাস বাঙলা ছবি হ'লে ছবি দেখতে দেখতে হাই তোলা চলে; হাই তুলতে তুলতে চলে ঘুমিয়ে পড়া।

শুধু প্রেক্ষাগৃহ কেন? গৃহের চেয়ে এখন যে কোনও স্থানই অনেক বেশী কমফর্টেবল। এক্সিবিজন হোক; এক্সিবিজনের সিজন যখন নয় তখনও হোক; সার্কাস হোক; জলসা হোক; চিড়িয়াখানা যাদুঘর শিবপুর বোট্যানিক্যাল গার্ডেন হোক; আর কিছু না হোক,—রাস্তায় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকুক দুটো লোক কলকাতায়,—দুশো লোক তাকিয়ে থাকবে কারণ না জেনেই সে আকাশের শূন্যের দিকে অর্থশূন্য দৃষ্টিতে! যদি জিজ্ঞেস করেন একশো আটানব্বই জনের মুখে এক জবাব পাবেন: কি হয়েছে জানিনা তো। প্রথম দু'জন অবশ্য জানে; তাদের একজন স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে আকাশে র‍্যাশান স্পুটনিক; আওয়াজ শুনেছে কানে: বিপ, বিপ, বিপ। আর একজন শুনেছে কোন্ খবর-কাগজে নাকি বেরিয়েছে এ্যামেরিকান স্পুটনিক আকাশে উড়ল বলে; রাশিয়ার স্পুটনিক বলেছে: বিপ-বিপ-বিপ; সেই এ্যামেরিকান স্পুটনিক বলবে: বাপ-বাপ-বাপ। মাত্র ওইটুকু জানে এই মনে করবে যারা তাদের কথাবার্তা শুনে তারা জানে না যে এতক্ষণে তাদের অনেকের পকেটের ভারই লাঘব করেছে ভীড়ের মধ্যে যে দু-একজন তারা এদেরই সাকরেদ। আজ যে মাসের পয়লা; মাইনের দিন।

এহ বাহ্য। বাস-ট্রাম রাস্তার কষ্ট সাধারণ মানুষের কষ্ট। পব্লিককে মারার জন্যেই যেমন পব্লিকম্যান—পব্লিককে কষ্ট দেবার জন্যেই তেমন পব্লিক কেরিয়ার। কিন্তু ট্যাক্সী? সেই কলকাতায় যারা নতুন বড়লোক তারা চাপত মোটরগাড়ী; যাদের ভাতে বাড়া পুরানো চালের বনেদী ঘর তাদেরই সৌখীনানার কৃতিত্বে চোখে পড়ত কলকাতার রাস্তা আলো করা জুড়িগাড়ী,

পুরাণো এবং নতুন বড়লোকদের মিল ছিল যে জায়গায় তার নাম অশিক্ষা। দু'দলের কেউই লেখাপড়া না করেও জানতো : লেখাপড়া করে যেই, গাড়ী চাপা পড়ে সেই। এই দু'দলের বাইরেও ছিল আরও গুটিকয়েক। তারা ছিল কাপ্তান; তাদের জন্যেই ছিল ট্যাক্সী।

ট্যাক্সীর জাত গেছে বড় ট্যাক্সী বেবি হবার পর; বেবিট্যাক্সী বেরুবার পর অতঃপর আর কাপ্তান নয়,—এখন যারা ট্যাক্সী চাপে তাদের আর যাই থাক তাদের ইজ্জত নেই। না থাকবারই কথা। সেদিন বড় ট্যাক্সীতে যারা আরোহী ছিল আর আজ যারা বেবির সওয়ার এদের মধ্যে দূরত্ব এতদূর যত দূরত্ব সম্ভবত কল্লোলের সঙ্গে নয় সদ্যোজাত বাঙলা মাসিক নবকল্লোলের। সেদিন ট্যাক্সী চাপত সেই সব বাড়ীর ছেলেরাই শুধু যাদের গ্যারেজে দাঁড়িয়ে থাকত ল্যান্সিয়া অথবা ডজ; যাদের আস্তাবলে ধ্বনিত হত অশ্বক্ষুরধ্বনি। তারা ট্যাক্সী চাপত কারণ বাড়ীর গাড়ী চেপে যত্র-তত্র গমনের অনুমতি মিলবার বয়স তখনও হয়নি বলে; ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে দোলের দুপুরে অথবা বাদলের সন্ধ্যায় গা ম্যাজম্যাজ করলে ফুর্তিটুর্তি করে মেজাজ ফেরাবার মৃগয়ায় বেরুবার একমাত্র বাহন ছিল ট্যাক্সী; সেই সব কাপ্তানদের কেবল মেয়েমানুষ নয়, ট্যাক্সীও বাঁধা ছিল। সেদিন যারা ট্যাক্সী চাপত তাদের চোখ থাকত স্পীডোমিটারের দিকে; জোরে, আরও জোরে। হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোন্‌খানে। এখন যারা ট্যাক্সী চাপে তাদের চোখ থাকে মিটারের দিকে; হাত থাকে পকেটে ঢোকানো। কারণ পকেট জানে যে প্রতিমুহূর্তে ট্যাক্সীর মিটার উঠছে।

এখন যারা বেবি ট্যাক্সীর খদ্দের তারা বাধ্য হয়ে ট্যাক্সী চাপে। ট্রাম, বাসের গায়ে অলিখিত নির্দেশ : চৌষট্টি জন বসিবেক; একশো আটাশ জন দাঁড়াইবেক, এবং দুশো ছাপান্ন জন ঝুলিবেক;—যখন সাজ্ঘাতিক তাড়ার সময় তাদের জন্যে দাঁড়ায় না

তখনই তাঁরা বেবি ট্যাক্সীর বধ্য হয়; বাধ্য হয়েই হয়। চারজনে মিলে ভাগাভাগি করে এক টাকার পথ চারানায় পার হয়। নয়তো, মনে মনে হিসেব করে রিক্সায় করে গেলে আট আনা পকেটে নিয়ে রিস্ক হতে পারে; রিক্সার মিটার নেই। আট আনায় বেবি ট্যাক্সী চাপায় রিস্ক তার চেয়ে কম; দশ আনা দেখা দেবার আগেই গন্তব্যস্থল না পৌঁছলেও নেমে যেতে আপত্তি কোথায়? কারণ তখন পকেটে আর কানাকড়ি না থাকলেও হাতে সময় রয়েছে প্রচুর; হেঁটে গেলেও বাকীটুকু যথাসময়ে উপস্থিত হতে কথা নয় বাগড়া হবার।

আর কারা বেবি ট্যাক্সীর প্যাসেঞ্জার? যারা মেয়ে অথবা পুরুষ কোনটাই নয়, যারা কাপুরুষ। শুধু কাওয়ার্ড হ'লেও কথা ছিল; এরা কাওয়ার্ডের ওপর আরেক কাঠি—জনে জনে সবাই একেকজন নোয়েল কাওয়ার্ডের লেখার চেয়েও জঘন্য নাটকের কুশীলব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কলকাতার বিত্তহীন মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের ট্যাক্সীতে নিয়ে বিকৃত-কামনা চরিতার্থ করা বিকৃততর অস্বাভাবিক প্রক্রিয়াই হচ্ছে এদের বেবি ট্যাক্সী ব্যবহারের একমাত্র কারণ। এদেরই কৃপায় বেবি ট্যাক্সী আজ সন্ধ্যের পর মোবাইল ব্রথেল ছাড়া কিছু নয়। এরা পুরুষ নয়; কাপুরুষ। ব্রথেলে যেতে ভয় পায়; ভদ্রনারীদের পায় না সঙ্গ; যাদের পায় আশ্রয়হারা অন্নহারা, তারা নিরুপায়। তাদের নিয়ে সাঙ্গুভেলির পর্দাঘেরা অন্ধকারে জায়গা না পেলে নেয় ট্যাক্সী। কালোবাজারী আর খাদ্যে ভেজাল দেয় যারা তাদের সঙ্গে একসঙ্গে এদেরও সব চেয়ে নিকটবর্তী ল্যাম্পপোষ্টে ঝুলিয়ে দেওয়ার সুসময় সমাগতপ্রায়। কিন্তু হায়! যে জহর কালোবাজারীকে ঝোলাবার কথা দিয়েছিলেন, গদি পেলে সব চেয়ে কাছের ল্যাম্পপোষ্টে, তিনি কেবল গদি পাননি; গদাও পেয়েছেন হাতে। এবং গদা হাতে গদগদ চিত্তে কালোবাজারীদের চেয়েও কালো কংগ্রেস

রাজত্বে বিস্মৃত হয়েছেন প্রতিশ্রুতি। হওয়ারই কথা অবশ্য; হবার কথা কারণ ল্যাম্পপোস্টে ল্যাম্পপোস্টে পোস্টার পড়ছি: 'এ জহর সে জহর নয়।'

কিন্তু যারা কাপুরুষ নয়,—রীতিমত পুরুষ তারাও কেউ কেউ রোদনভরা প্রথম বসন্তের নানা রঙের দিনে বেবি-ট্যাক্সীর নিরাপদ নির্ভরযোগ্য বন্দরে নোঙর করছে যৌবনের তরণী নিরুদ্দেশ যাত্রায়। এখন যারা অধুনা বেবি-র খদ্দের, তারা আসলে কিন্তু এককালে রিক্সাকেই মেনে নিত সোনার তরী বলে। প্রথম প্রেমের ভরা বর্ষায় লাবণ্যকে নিয়ে অমিতরা সেদিন মানুষের পিঠেই সওয়ার হতে চাইত; চাইত কারণ দীর্ঘতর করে তুলতে চাইনীজ রোল্‌স্‌ই ছিল শ্লো-ওয়াকিং রেসের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত রথ। জীবনের প্রথম নারীসঙ্গের খেয়াল যত বিলম্বিত লয়ে গাওয়া যায়, ততই মধুর হয় মুহূর্তরা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কলকাতায় রিক্স সেই আছে, কিন্তু রিক্সওলা আর সেই নেই। অনেক লোক আছে আপনার আমার এর ওর তার—সকলেরই জানা অনেক অনেক স্ত্রীলোকও আছে, যারা পিশাচকে বলে পিচাশ; তারাই রিক্সো উচ্চারণ করতে না পেরে বলে রিস্‌কো। জেনে আমরাই ভুল বলি: রিক্সো; না জেনে তারাই ঠিক বলে: রিস্‌কো।

ঠিক বলে কারণ আজকের রিক্সো সাংঘাতিক riskও হয়েই দাঁড়িয়েছে প্রথম প্রেমের ভার বইবার ব্যাপারে। আজও অমিত-লাবণ্য রিক্সায় উঠতে যায় নির্জন রাস্তায় নিরুদ্দেশ যাত্রায়। কিন্তু রিক্সাওলার প্রশ্নে থেমে যায় তারা: কাঁহা যায়গা? দীর্ঘপথের কথা শুনে মায়াবনবিহারীদের বিহারী রিক্সাওলা জানায়: এক রূপেয়া লাগেগা। উঠতে উদ্যত লাবণ্য এক সঙ্গে এত রূপ যার মত আর কোথাও পাওয়া অসম্ভব, সেই লাবণ্য নেমে আসে ওই এক রূপেয়া শুনেই—কারণ এ যুগের লাবণ্যরা জানে যে, এক রূপেয়ায় এত নয়া পয়সা, যে তা প্রেমের জন্যে দেওয়া যায় না,

দর না করে। অমিত রায় প্রথমে আদর করে রিক্সাওলাকে, তারপর দর করেঃ এক রূপেয়া নেহি; বারানা। রিক্সাওলাই ভদ্রলোক; তার এক কথাঃ এক রূপেয়া। অমিত রায় পকেটের ব্যাপারে অত্যন্ত পরিমিত: সেও সমানে বলেঃ এক রূপেয়া নেহি; বারানা—। রিক্সাওলার মনে পড়ে, সে ভদ্রলোক নয়,—এক কথায় তার ঠিক থাকার নেই এতটুকু প্রয়োজন; সে নেমে আসে তৎক্ষণাৎ: উঠিয়ে; ঠিক হ্যায়; বারানাই লেগা; লেকিন—

অমিত আব লাবণ্যরা সবে বসেছে গদিতে তখন; রিক্সাওলা ঘন্টি বাজাবার আগে শেষ করে তার অসমাপ্ত বাক্যঃ বারানাই লেগা; লেকিন পর্দা নেহি লাগায়গা!

আজকের লাবণ্যরা হোক যত প্রগতিশীল,—প্রথমে প্রেমের বেদনাভরা বসন্তের দিনে বিক্সায় ওঠে যখন লাবণ্যরা অমিতদের নিয়ে, তখন সেই একটি সময়ে অন্তত তারা পর্দানসীন হতে পারলে বেঁচে যায় কেন, কে জানে; শুধু পর্দানসীন নয়; দিনের আলোয় হতে চায় অসূর্যম্পশ্যা।

পর্দা না লাগানো রিক্সো তাই রিক্সো নয়; রিস্কোই বটে। তাতে ওঠার riskও কম নয় যে।

তাদেরই কেউ কেউ মাসের প্রথম রবিবারের সন্ধ্যায় বেবিট্যাক্সী পাওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনের দুঃসময়েও দুরূহ করে তুলেছে। বড় ট্যাক্সী যেদিন একা ছিল, সেদিন পাওয়া যেত ট্যাক্সী; বেবিট্যাক্সীর দুর্দিনে এখনও দু'একখানা বড় ট্যাক্সী পাওয়া যায়; কিন্তু প্রায়ই যা পাওয়া যায় না, তাবই নাম বেবি-ট্যাক্সী।

বাস-ট্রামের জন্যে দাঁড়ানো; জায়গাব জন্যে পরের পা মাড়ানোর অর্থ হয়; কারণ? অর্থের অভাবই সেই অর্থের কারণ। কিন্তু ট্যাক্সীর জন্যে ঘন্টার পর ঘন্টা রাস্তায় দাঁড়ানো এবং পরে দাঁড়াতে আর না পেরে প্রথমে বসে এবং পরে শুয়ে পড়ার মানে হয় কোনও? সেই প্রবাদ-বাক্যঃ বসতে পেলে শুতে চায় নতুন

করে মনে হয় বটে, কিন্তু মানে হয় না তার। ট্যাক্সীর ভাল-মন্দ দেখবার কারণে ট্যাক্সী এসোসিয়েশানের জয় হোক, ট্যাক্সী পাবার জন্যে এই ট্যাক্সেসান বন্ধ হোক কিন্তু অবিলম্বে।

প্রথম যখন এই বাচ্চা ট্যাক্সী দৌড়তে শিখল তখন তা সংখ্যায় এত কম, যে বড় ট্যাক্সী করতে হতো বেবিট্যাক্সী পাবার জন্যে। এখন বেবিরা সংখ্যায় কম নয় বটে, কিন্তু খদ্দেরের তুলনায় এখনও নেহাৎই অনেক কম। কিন্তু কম বলেই দুঃখ নয়; দুঃখের কারণ বেবিট্যাক্সী হ'লে দুঃখ ছিল না। দুঃখের কারণ বেবির চালক; এক হাতে সিগারেট, আর এক হাতে রিষ্টওয়াচ। ওঠবার আগেই প্রশ্ন: কোথায় যাবেন? যে মুখে যাচ্ছে সে, যদি তার উল্টোমুখে যেতে চান তাহলে শুনবেন গাড়ী খারাপ,—গ্যারেজে যাচ্ছে; গ্যারেজের রাস্তায় যাবার লোক ছাড়া নেবে না। আবার আটানার পথ হলে দাঁড়াবে না: কারণ তখন খাবার সময়। আট টাকার পথ বলে আট আনা হওয়া মাত্র যদি নেমে যান তাতে আপত্তি থাকলেও টিঁকবে না জানে বেবির ড্রাইভার; কারণ আটানা উঠেছে যেখানে মিটারে সেটা আপনার মহল এবং তার বেপাড়া।

অফিসের টাইমে আপনি যদি ঢোকেন এ দরজা দিয়ে, ও দরজা দিয়ে ততক্ষণে ঢুকে বসেছে দু'জন; বাস! আপনাদের চারজনেরই তাড়া; হয়ত কালোবাজারের সুবর্ণ সুযোগ এসে গেছে হাতের মুঠোয়। কিন্তু হ'লে হবে কি; কালোবাজারের বদলে বিবাদমুখর আপনাদের দু'দলকে নিয়ে ট্যাক্সী ড্রাইভার কখন্ ঢুকে গেছে লালবাজারে, খেয়াল করেননি। অফিসের টাইমে এই; পোষ্ট অফিসের টাইমে আরও মজা। শনিবার সন্ধ্যায় আপনার স্ত্রীকে নিয়ে ঢুকেছেন এ দরজা দিয়ে বেবির; ও দরজা দিয়ে শ্যালিকার আগে আগে উঠেছেন জামাইবাবু। আপনার স্ত্রী এবং ওনার জামাইবাবুকে নিয়ে বেবি যতক্ষণে উধাও ততক্ষণে পরের শ্যালিকার

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আপনার মনে পড়ে সত্যেন দত্তের অনুকরণে রচিত সেই অনুবাদ :—

জোটে যদি মোটে একটি শ্যালিকা
বউয়ের আড়ালে ডাকিও প্রিয়ে ;
দুটি যদি জোটে একটিকে তার
বউ মারা গেলে করিও বিয়ে।

এতেই শেষ হলে বেবিট্যাক্সীর অসুখ কথা ছিল না আর ; কিন্তু 'শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে।' করোনারী থ্রম্বসিসের ওপরও আছে ক্যান্সার ; গোদের ওপর বিষফোঁড়া ; মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। অনেক কষ্টে, অনেক অপেক্ষায়, অনেক জুতের হওয়ায় কুষ্ঠি যদি পাওয়া যায় বেবিকে তবু চাপা যায় না ট্যাক্সী। চাপা যায় না, কারণ চাপা দেবার ক্ষেত্রে বেবির অবাধ স্বাধীনতা ; কিন্তু বেবিতে চাপবার বিলাস তিনজনের জায়গায় চারজন হলেই মহাভারত অশুদ্ধ। বিস্ময়,—মানুষের পিঠে মানুষ মেয়েমানুষ এবং ছেলেমানুষ কতজন চাপবে তার লিখিত নির্দেশ নেই ; কিন্তু যন্ত্রের বুকে তিনজনের বেশী অনেকজনেরও বারণ আসন সংগ্রহে ; হবার কথা। মানুষ আজকে যন্ত্রের চেয়েও অধম। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করার যুগ বহুদিন বিগত ; মানুষকে পিটিয়ে যন্ত্র না করা পর্যন্ত সুখ নেই আজ ; তাতেই না মানুষের এত যন্ত্রণা!

অসাধু বেবি-ট্যাক্সীওলা আছে ; তিনজনের বদলে দশমাথা গাড়িতে তুলতেও তার আপত্তি কম অথবা একেবারেই নেই যদি মিটারের ওপরে পাওয়া যায় উপরী কিছু। অসাধু না বলে অবশ্য এদেরই সাধু সাধু বলার যুগ এখন। মদ বন্ধ হলেও আমোদ অব্যাহত রাখে যারা রসিদ ছাড়া হাতে কিছু পেয়েই ; আর কনট্রোল হলেই চাল বাড়ন্ত যাদের গুদামে ; অথবা ঠিক ঠিক ওষুধ পড়লে ওষুধ থেকে আরম্ভ করে চাল চিনি কয়লা, তেল-নুন-লকড়ি, সিনেমার অথবা খেলার কোনও টিকিট পাওয়াই অসম্ভব নয় যে

দেশে, সেই আলেকজাণ্ডার উবাচ কি বিচিত্র এই হিন্দুস্থানে কেবল-মাত্র বেবি ট্যাক্সীর মালিককে অভিযুক্ত করাটা আর যাই হোক, যুক্তিযুক্ত নয় মোটেই; এদের সকলের সঙ্গে একযোগ করে আরেকযোগে জয়যুক্ত হবার সম্ভাবনাই যখন দেখা যাচ্ছে আজ তখন তো নয়ই [বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমাবো।]।

কিন্তু সত্যি সত্যি সাধু বেবি ট্যাক্সীওলাও আছে যে আবাব [সাধু সাধু পদে পদে]। পদে পদে বিপদে ফেলে তারাই; তিনজন নিয়ে উঠলেও তাদেব আপত্তি কখনও কখনও আপনার পক্ষে বোঝাই শক্ত হয প্রথমে; অর্থাৎ বোঝা হয়ে দাঁডায় মাথায় যখন, তখনও বোঝা যায় না তাব না-যাওযার আসল কারণটা কি। আপনি; আপনার স্ত্রী এবং একটি বছরাষ্টেকেব young hopeful আপনার; পুবো তিনজনও নয; আড়াইজন বলতে হয় সঠিক বলতে গেলে। মাথা গুণতি না হয় তিন-ই হলো: মানোেনই আপনি। কিন্তু তিনজনের বোঝাব ওপর কোন শাকের আঁটিতে উটের পিঠ ভাঙবাব ভয়ে তাহলে বেবির চালক যেতে গববাজি। ড্রাইভারকে যদি জিজ্ঞেস কবেন, কেন যাবে না সে,—তাহলে ড্রইভার জবাব দেবেঃ চারজন প্যাসেঞ্জার নেবার হুকুম নেই। তখন আবাব প্রশ্ন আপনাব—চাবজন কোথায়? আমরা তো তিনজন—। জবাব না দিয়েই জবাব দেবে ড্রাইভার; তাকাবে আপনাব স্ত্রীর দিকে; আর আপনাব আঁখিপদ্মেও প্রতিভাত হবে তখন যে আসলে আপনাবা চারজনই বটে। মনে পড়ে যাবে ক্লাস ফাইভের প্রশ্নপত্র; যে স্ত্রীর পুত্র হব হব হচ্ছে এমন স্ত্রীকে এককথায় কি বলে? এতদিনে আপনার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তাব উত্তব; এক কথায় তাকে যা বলে ট্যাক্সী-ড্রাইভার তা জানে কিন্তু বলে না; দেখিয়ে দেয় আপনি প্লাস আপনার আলাল হলেন দু'জন; আর আপনার সেই আসন্নপ্রসবা একাই হলেন দুই। দুয়ে দুয়ে সব সময়ই দুধ

নয়, কখনও কখনও দুই এ-দুইএ চারও হয়, আর চার [illegible] মানেই আপনাদের পাচার করা তখন সাধু বেবিট্যাক্সীতে একেবারেই অসম্ভব।

মেঘ ও রৌদ্র ; আলো ও ছায়া ; সাদা ও কালোর মতই সাধু ও অসাধু দুই না হলেই তাই দুনিয়া অচল। জগৎসুদ্ধ সবাই শুদ্ধ অথবা সাধু হলে বসুন্ধরা হ'ত না এত সুস্বাদু। কারণ সেই অচিন্ত্য exprssion ধার করে, অচিন্ত্যকুমারের এক্সপ্রেসন ইনভার্টেড্ কমা-র মধ্যে উদ্ধার ক'রে বলতে পারি সাধু ট্যাক্সীওলার জন্যেই যেমন 'পদে পদে বিপদ' ; অসাধু ট্যাক্সিওলার কৃপায় তেমনই আবার 'পায়ে পায়ে উপায়।'

কিন্তু বেবিট্যাক্সীর অথবা এ-কলকাতার কথা বলতে বসিনি ; বলতে বসিনি বলেই তার সম্বন্ধে এত কথা বলতে হ'ল। এতে আপত্তি করলে আমি নাচার। আধুনিক বাঙলা গল্প বলার এইটেই লেটেষ্ট ঢং যে। গল্পের আরম্ভেই দেগে দেওয়া থাকে : মিণ্টু মাসীর স্বামী যেদিন মারা গেলেন সেদিন— ; আচ্ছা মিণ্টু মাসীর কথা এখন থাক। সেই এত ঢঙ জানো জাদু এত ঢঙ জানো— ষ্টাইলে যখন বলি বেবিট্যাক্সী অথবা একলকাতার কথা এখন থাক।

তার বদলে বলি সেই উনিশশো চৌত্রিশ সালের কলকাতার কথা ; বেবিট্যাক্সী নয় ; বড় ট্যাক্সীর রূপকথা ; সব ট্যাক্সীর নয় ; বিশেষ ট্যাক্সীর যে বিশেষ একজনের অপরূপ কথা বলতে বসেছি আজ, তার নাম অর্জুন সিং।

অর্জুন সিং বাঙলা বলত ; এ রকম বাঙলা যাতে আমার প্রথম দিন থেকেই সে কোন কথা বললেই মনে হ'ত মাথায় পাগড়ী, হাতে বালা, কোমরে কৃপাণ, সর্বোপরি ওর সারা বদন-জোড়া দাড়ি ; সবটাই ওর ভেক। দাড়িটা তো বটেই ; মনে হ'ত দিই এক হ্যাঁচকা টান, —যাতে নিমেষে খুলে আসে শিখ মেক-আপ আসলে এক বাঙালী তনয়ের। তারপরেই অবশ্য মনে পড়ত উনিশশো চৌত্রিশ সালটা মহাভারতের যুগ নয় যে, যুধিষ্ঠিরের অপকর্মের ফল

ভুগতে [illegible]র শেষ বছরে অজ্ঞাতবাস করতে বাধ্য হয়েই অর্জুনের এই অত্র মেক-আপ ; একান্ত অগত্যাই। কিন্তু এ অর্জুন সে অর্জুন নয় ; সে অর্জুন ছিল পার্থ ; তাঁর রথ চালাতেন যিনি, সেই পার্থসারথি শুধু রথের নয়, পার্থেরও ছিলেন চালক। রথ চালাবার জন্যে অর্জুনের সখা হলেই সেদিন চলত ; আজকের যুগে ট্যাক্সী চালাতে অর্জুন হতে হয় ; পার্থসারথি হলে চলে না। শুধু অর্জুন নয় ; অর্জুন সিং হলেই তবেই যেন ট্যাক্সীর ষ্টিয়ারিং ধরা কারুর মানায়।

অবশ্য যদি আমার সন্দেহ সত্য হ'ত, তাহলেও একথা ঠিক উনিশশো চৌত্রিশ সালেও কোনও বাঙালী অর্জুনের শিখ অর্জুন সিং-এ রূপান্তরিত হতে আর যাই নকল সাজের দরকার থাক, আসল দাড়ির অভাব হবার কথা নয়। কথা নয় তার কারণ, দাড়ি বস্তুটা সৌভাগ্যবশতঃ পয়সা নয় ; পয়সা বাড়ে কামালে ; আর না কামালে তবেই যা বাড়ে, তারই নাম তো দাড়ি। তাই অর্জুন সিং-এর দাড়ি টানলে তার মাথা আসত না বলেই মনে হয়। কিন্তু একথা আজও সত্য, সেদিনও যেমন অসত্য ছিল না যে তার বাঙলা শুনে আমাব সত্যিসত্যি অন্তরঙ্গ হবার ইচ্ছে হ'ত অর্জুন সিং-এর ; ইচ্ছে কবত জিজ্ঞেস করি—কেন শিখ সাজবাব এই মিথ্যে চেষ্টা তোমার ; তুমি অর্জুন হতে পারো,—বোস-ঘোষ-দাশগুপ্ত ; চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে অথবা যা খুসী ; কিন্তু তুমি কোনও জন্মে সিং নও।

অন্তরঙ্গ হলেও লাভ হত না জানি। অর্জুন বাঙলা বলতে জানতো ; তার চেয়ে যা ভাল, তা হচ্ছে গল্প বলতে। কিন্তু এসবের চেয়েই ; সবচেয়ে ভালো করে সে যা আয়ত্ত করেছিল, তার সঙ্গে তুলনা চলে কেবল গাড়ী চালানোরই, আর কিছুর নয়। সেই বিস্ময়কর বস্তু, যা বিশ্বের বহুৎ বাঘা-বাঘা-গপ্পো বলিয়েদের অনেকেই জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আয়ত্ত করতে পারেননি, হচ্ছে সেই জ্ঞান, যা ঠিক জায়গায় থামতে জানা শেখায়। গল্প বলা হচ্ছে গাড়ী

চাঁলানোর মতই ; তার আরম্ভর আগে আরম্ভ হলেই পাঠক আর এগুবে না ; এবং এমন জায়গায় গিয়ে ব্রেক কষা চাই, যেখানে পৌঁছেও পাঠকের জিজ্ঞাসা ফুরোয় না ; গল্প খতম জেনে সে বলে বসে : তারপর ? এই বাকীটুকু বলার লোভ সম্বরণ করতে জানে না, সে নয় কিছুতেই লেখক।

অর্জুন সিং গল্প বলতে জানতো ; লিখতে নয়। জানতো বলেই সব শোনবার পরও যখন আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেত : তারপর, —তখন অর্জুন সিং মুখে জবাব দিত না আর, তার চোখ চলে যেত ট্যাক্সীর মিটার অভিমুখে, আমার চোখ তার চোখকে অনুসরণ করে গিয়ে যেই পৌঁছত মিটার বরাবর, সেই বুঝতাম অর্জুনের চোখ যা বলতে চাইছে তার সরলার্থ হচ্ছে এই যে, এবার এসো ; কারণ ?—কারণ,—ট্যাক্সীর মিটার উঠছে। কথাবার্তার শেষে আছে অনিবার্য : নটে গাছটি মুড়োলো, —আমার কথা ফুরোলো, অর্জুন সিং-এর অপরাপর বার্তার শেষে অনিবার্য যা সে বলেনি কখনও কিন্তু তার চোখে পড়েছি প্রতিবার তাই হচ্ছে এ কাহিনীর শিরোনামা : ট্যাক্সীর মিটার উঠছে।

এ কাহিনীর নামই নয় কেবল,—সবটাই অর্জুন সিং-এর। কমা, সেমিকোলন ; ফুলস্টপ পর্যন্ত কিছুই আমার নয়। কেবল গৌরচন্দ্রিকাটুকুর এই অংশটাই তার নিজের নয়, তবে এ অংশের প্রয়োজনও খুব বেশী ছিল বলে মনে হবে না পাঠকের উপসংহার-পর্বের শেষ পৃষ্ঠায় পৌঁছবার পর। দ্বিখণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গের নানাবিধ সমস্যার বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো, অথবা পশ্চিমবঙ্গের গোদা মন্ত্রীসভার ওপর বিষফোড়ার মতো যেমন একাধিক ডেপুটি মিনিষ্টার দেশের প্রয়োজনেই দেখা দিয়েছে ; এ কাহিনীর গৌরচন্দ্রিকার উপস্থিতির অবশ্যম্ভাবিতার ভাগ তার চেয়ে বেশী বলে প্রতিভাত নয় এ গৌর-চন্দ্রিকা ভাঁজতে বাধ্য হয়েছেন যিনি, স্বয়ং তাঁর কাছেও।

পূর্বমেঘ

অর্জুন সিংএর অভিজ্ঞতার সিন্দুকে সব চেয়ে ঝকমকে অলঙ্কার ঠিক কোনটা বলা শক্ত। তবু অর্জুনের গল্প বলতে বসলেই যার ইতিবৃত্ত অবধারিত ভেসে আসে প্রথম, স্মৃতির প্রোজেকশান মেসিনে এসে দাঁড়ায় সর্বপ্রথম তার নাম বৃন্দাবন গোমেজ। সেই সময় এবং তার কিছু আগে পরের বাঙলা সাহিত্যের কথা যাদের মনে আছে তাদের মনে থাকার কথা আজও যে বৃন্দাবন গোমেজ কারুর আসল নাম নয়; একটি সাঙ্ঘাতিক হাল্লাবাধানো লেখকের বিস্ময়কর ছদ্মনাম। শরৎচন্দ্র তখনও অস্তোন্মুখ পূর্ণিমার প্রশান্তিতে বাঙলা সাহিত্যের আকাশ আলো করে আছেন; ঠিক সেই সময়েই শুকতারার মত দপদপে আবির্ভাব হলো বৃন্দাবন গোমেজের। আবির্ভাব মাত্রই দৃষ্টি আকর্ষণ এবং দ্বিগ্বিজয় করলো এই সম্পূর্ণ অপরিচিত অভ্যাগত। এত চকিতে ঘটে গেল সমস্ত ব্যাপারটা যে বিচার, বিশ্লেষণ, সমালোচনার অবকাশ পাবার আগেই জনগণের রায় ভক্স পপুলির ভোটে ভরে গেল প্রতিষ্ঠার ব্যালটবক্স।

সেই চরমাশ্চর্য ছদ্মনামের আড়ালে আসল মানুষটা ছিলো আরোও যে অনেক বেশী বিস্ময়ের অর্জুন সিং তা আমাকে সবিস্তারে বলেছিল। প্রথম যেদিন বৃন্দাবন তার গাড়ীতে চাপে সেদিন আর পাঁচজন প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে তার কোনও পার্থক্য এতটুকু চোখ পড়েনি অর্জুনের। বৃন্দাবন গোমেজের সঙ্গে ছিলেন আরেকজন মহিলা। অর্জুন সিং স্বভাবতঃই তাদের দুজনকে স্বামী-স্ত্রী বলে

ধরে নেয়নি ; না নেওয়ার কারণ অবশ্য ক্রমশ,—এখন প্রকাশ্য নয়। গাড়ী সামান্য এগুবার আগেই কথাবার্তা দুজনের এগিয়ে গিয়েছিল অনেকদূর। বৃন্দাবন এবং মহিলা দুজনেই বিবাহিত বটে কিন্তু কেউই কারুর স্বামী-স্ত্রী নয় ; অথবা উল্টোপক্ষে তারা উভয়েই অন্যের স্বামী-স্ত্রী।

সেই বিবাহিত মহিলার নাম চন্দ্রমল্লিকা; মাথার চুল সেই উনিশশো চৌত্রিশ সালেই ছেঁটে ক্ষান্ত হয় নি সে ; নামও ছোট করে ফেলেছিল অনেকটাই; মল্লিকা। বৃন্দাবন গোমেজের সে ভয়ঙ্কর এ্যাড-মায়ারার। কিন্তু বৃন্দাবন গোমেজ কিছুতেই স্বীকার করবেনা যে সে-ই বৃন্দাবন। মেয়েটিও নাছোড়বান্দা; সে স্থিরনিশ্চয় যে বৃন্দাবন তাকে এভয়েড করবার জন্যেই এই মিথ্যের আশ্রয় নিচ্ছে।

এই সময়ে মনে আছে আমাব, আমি জিজ্ঞেস করলাম : তুমিকি করে জানলে অর্জুন যে মহিলাব সঙ্গে সেই ভদ্রলোক সত্যিই বৃন্দাবন গোমেজ !

অর্জুন বাধা পাওয়ায় বিবক্ত হলো : তাকালো আমার দিকে। এমনভাবে তাকালো যে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো খবর কাগজের পাতায় কলামের শেষে লেখা সেই : ইহার পর ৫ম পৃষ্ঠার ৭ম কলমে পড়ুন ; বুঝলাম অর্জুন যথাসময়ে ব্যক্ত করবে আমার প্রশ্নের সদুত্তর। অতএব আমি দ্বিতীয়বার টুঁ শব্দ না করবার অঙ্গীকার করলাম; এবং অর্জুন সিং আবার তার গল্পের একসিলেটারে পা দিল।

মল্লিকার সঙ্গে বৃন্দাবনেব হঠাৎ দেখা হয়ে যায় এক প্রকাশকের দোকানে।

সেই থেকেই মল্লিকা লেগে ছিলো। অর্জুন সিং-এর টাক্সীতে মল্লিকা-বৃন্দাবনপর্ব জমে ওঠবার আগে মল্লিকা বৃন্দাবনকে চায়ে নেমন্তন্ন করে কয়েকবার ; বৃন্দাবন প্রথমে বুঝতেই পারেনি যে মল্লিকা তাকেই বৃন্দাবন বলে ঠাউরেছে। চায়ে নেমন্তন্ন করবার যে

উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে মল্লিকা তা হচ্ছে সে লিখতে চায়; বৃন্দাবন সেই লেখা দেখেই বোঝে মল্লিকাকে দিয়ে আর যাই সম্ভব হোক লেখা চিরকালই অসম্ভব থাকবে। পরে অবশ্য বৃন্দাবন নিজে নিজের ভুল বুঝতে পারে; মল্লিকা লিখতে চায়নি কোনও দিন। কখনও লেখার নাম করে নামকরা লেখকদের সঙ্গে; কখনও গানের নাম করে নামকরা গাইয়েদের সঙ্গে আলাপ করাই মল্লিকার জীবনের একমাত্র ধ্রুবতারা। মল্লিকার একার নয়; মল্লিকাদের একটা দল ছিল যাদের প্রত্যেকেই বিবাহিত; ছেলের মা; এবং প্রত্যেকেরই রেডিমেড ছিল বিবাহিত জীবনে তারা কিরকম অসুখী· তারাই একটুখানি বাস্তব আর নিরানব্বই ভাগ অবাস্তব, অলীক অবিশ্বাস্য, অলৌকিক এক রূপকথা।

বৃন্দাবনের সঙ্গে মল্লিকার যখন দৈবাৎ দেখা তখন মল্লিকার বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে; যৌবন যদি কখনও এসে থাকে বিদায় নিয়েছে বহুদিন আগেই। তখনও অবশ্য খুকী সেজে থাকবার প্রাণান্ত চেষ্টা ভয়াবহ করে তুলেছে আরও। তিন ছেলের মা,—তবু লম্বা বেণী পিঠের ওপর সাপের মত হেলছে-দুলছে। ঝুলে পড়া বুককে জাহাজ বাঁধা দড়ির পাকের পর পাকে সোজা রাখবার হাস্যকর অবিমৃষ্যকারিতা; মুখে গালে বীভৎস হোয়াইটয়াশ; ভুরু আঁকা। জামাকাপড় কালো অঙ্গে টুকটুকে লালরঙের; দূর থেকে দেখে মনে হয় জীবন্ত টিকে আগুণ ধরিয়ে আসছে; মোটা, বেঁটে এবং নিতম্ব, যা না থাকলে মেয়ে হয়ে জন্মানোর কোনও মানে হয় না, সব চেয়ে নোটেবল এবসেন্টি মল্লিকার দেহ-মন্দিরে। অর্থাৎ এক কথায় এক অঙ্গে এত অপরূপ লাবণ্যহীনতার সাক্ষাৎ কদাচ মেলে।

এর ওপর আরও এক গুণ ছিল মল্লিকার। মেয়েমানুষ হয়ে এত জলজ্যান্ত মিথ্যে এতটুকু না ভেবে চিন্তে কেউ অনর্গল বলে যেতে পারে—মল্লিকার সঙ্গে আলাপ না হলে কারুর পক্ষেই তা

বিশ্বাস করা কেবল শক্ত নয়, অসম্ভব। ধরা পড়লেও লজ্জা, ঘেন্না অথবা ভয়ের একপার্সেন্ট উদ্রেকও কখনও কেউ দেখেনি তার মধ্যে। পাড়ায়-বেপাড়ায় এত অসংখ্য লোকের সঙ্গে এতবার তাকে এখানে ওখানে দেখা গেছে যে, তার সঙ্গে বেরুবার দু-একদিনের মধ্যেই বৃন্দাবন পর্যন্ত লাফিং ষ্টক হয়ে দাঁড়ালো যে দু-চার জনের চেখে পড়ে গেল এই জোড়ে সান্ধ্য-ভ্রমণের ছবি তাদের মারফৎ যাদের দেখবার সুযোগ হয়নি তাদের সকলের কাছে। অথচ মল্লিকার তাতে এতটুকু এক ইঞ্চিও কিছু এসে গেছে বলে মনে করবার কোনও রকম কারণ ঘটেনি দেখে বিস্মিত হলো বৃন্দাবন।

কিন্তু যে প্রকাশক বন্ধু আলাপ ঘটিয়ে দিয়ে দূর থেকে মজা দেখছিলো সে বিস্মিত হলো না মোটেই। মল্লিকাকে তারা একজন বাজারের মেয়েছেলেকে যা বলা যায় না সেই রকম গালাগাল দিয়ে দেখেছে মল্লিকা কেঁদে ফেলেছে কিন্তু তারপর যথারীতি দুদিন বাদে আবার গিয়ে হাজির হয়েছে তাদের অফিসে একজনকে সঙ্গে করে যাব বয়স মল্লিকাব বড় ছেলের চেয়ে সামান্য বেশী। বৃন্দাবনের অবশ্য বিস্মিত হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। প্রকাশকের দোকানে দেখা হবার সময়েই মল্লিকার একটা লেখা দিয়ে বলেছিলো তার লেখা দেখে দিতে হবে একটু। বৃন্দাবন একটা ফোন নাম্বার দিয়ে বলেছিল ফোনে জানিয়ে দেবে তার মত। ফোনে মত জানানো ফাইন্যাল হলো না; চায়ের নেমন্তন্ন করলো মল্লিকা। কাফে ডি মণিকোয় দুজনে বসবার পর মিনিট দশেকও কাটে নি; কফির কাপ ঠেলে দিয়ে মল্লিকা বলল। কফি খাব না—

তবে অন্য কিছু দিতে বলি—

না অন্য কিছু খাবো না;

না খেলে তো আর রেস্তরাঁয় বসতে দেবে না; তাহলে এবার ওঠা যাক—

না; খাবো—

কি খাবে বলো? বয়কে ডাকি—

ঘণ্টা বাজাতে উদ্যত বৃন্দাবনের হাত চেপে ধরলো মল্লিকা; তারপর নিজের ঠোঁট এগিয়ে নিয়ে গেল বৃন্দাবনের ঠোঁট বরাবর। বৃন্দাবন গোমেজ কি বলবে না ভেবে পেয়ে বললো: হবে হবে; ওসব পরে হবে—। বলেই অপেক্ষা করল না আর; ঘণ্টা বাজিয়ে হাঁকলো: বয়—। সমস্ত ব্যাপারটা এত আচমকা ঘটে গেল যে বৃন্দাবন গোমেজ রীতিমতো কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে ভাবতে লাগলো মল্লিকাকে যা করতে বাধা দিলো বৃন্দাবন মল্লিকা সত্যি সত্যি তারই জন্যে ঠোঁট এগিয়ে এনেছিলো তো! না কি,—বৃন্দাবন স্টানড্ হয়ে খানিকটা বেশীদূর ভেবে ফেলেছে বাস্তবে যা ভাববার কারণ অত্যন্ত অল্প অথবা একেবারেই ছিলো না। নিজের কোনও লেখায় এ চিত্র উপস্থিত করবার দুঃসাহস হতো না তার সেই উনিশশো চৌত্রিশ সালেও এবিষয়ে সম্পুর্ণ নিঃসন্দেহ সে, শরৎচন্দ্রের জীবনকালেই যার কলম দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে আবালবৃদ্ধবণিতার, যার দুর্দান্ত হাল্লামাচানো ছদ্মনাম: বৃন্দাবন গোমেজ। মাত্র একদিনের কয়েক মুহূর্তেব আলাপ যার সঙ্গে দিন দুয়েক আগে; মাঝে একদিন দুর্ভাষযন্ত্রেব মারফৎ আলাপ আর আজ রেস্তেবাঁয় পাশাপাশি বসা এই প্রথম,—এরকম একজন বঙ্গললনা তিনটি সন্তানের যে জননী সে উদ্যত হতে পাবে ভাবতীয় আলাপের মান অনুযায়ী এমন দুঃসাহসে,—বৃন্দাবনের কলমেও কাগজের মুখে একথা উচ্চারিত হলে তা আর যা বলেই গণ্য হোক বাস্তব জীবনভিত্তিক বলে স্বীকৃত হতো না কিছুতেই।

বৃন্দাবনের মনের মধ্যে যখন আথালপাথাল করেছে এই কয়েক মুহূর্ত আগের উত্তেজক চলচ্চিত্র তখন কিন্তু চুপ করে বসে নেই মল্লিকা। সে যে কত দুঃখী; সংসার, স্বামী, সন্তান-সোহাগবঞ্চিতা হতভাগ্য যদি বৃন্দাবন জানতো তাহলে তারপাষাণ হৃদয় গলে নিশ্চয়ই হতো সূর্যশশীতারাদর্পণ নির্ঝরিণী। অবশ্য বৃন্দাবনের বোঝা

উচিত ছিলো ব্যাপারটা ঘটবার আগেই যে এমনই কিছু ঘটতে যাচ্ছে একটা। কারণ মল্লিকা রেস্তোরাঁয় বসেই বৃন্দাবনকে বলেছিল যে তার বান্ধবীরা তাকে সবাই বলেছে যে তার জীবনে ঘটে গেছে কোথাও অসহ্য সুখের কোনও দুঃসহ বিপর্যয় আর সেই কথা শুনে সে জবাব দেয়নি কিছু; গান গেয়েছে : আমার পাষাণ যাহা চায় তুমি তাই; তুমি তাই গো।

তখনই বৃন্দাবনের বোঝা উচিত ছিলো পরের দৃশ্যে কি ঘটতে যাচ্ছে। কিন্তু যদিও বা সে ভাবতে পারত তেমন কিছুর পূর্বাভাস তবুও মল্লিকা চুম্বনপ্রত্যাশী হবে প্রথম দিন রেস্তোরাঁয় বসেই এতটা ভাববার মত উর্বর ছিল না বৃন্দাবন গোমেজের মাথাও। বড় জোড় স্বামীর অত্যাচারের ব্যাপার নিয়ে দু'ফোঁটা চোখের জলের সেই পুরাতন কাহিনীর জন্যে প্রস্তুত থাকতে পারতো সে; আর নয় বৃন্দাবনের সঙ্গে মল্লিকার আরেকদিন নিভৃত সাক্ষাতের অনুমতি ও সময়ভিক্ষা সম্ভব ছিলো খুবই। অথবা মল্লিকার সই সংগ্রহের খাতায় বৃন্দাবন গোমেজের স্বাক্ষরের সঙ্গে এমন দুয়েকটি কথা অন্তত যা মল্লিকার মনের খাতাতেও হৃদয়ের সবুজে গাঁথা থাকে চিরকালের অক্ষরে।

কিন্তু বৃন্দাবনের অবাক হবার তখনও একগাদা বাকী ছিলো। সেদিন রেস্তোরাঁয় বৃন্দাবন মল্লিকাকে প্রচুর বাণী দিলো; বিবাহিত এবং সন্তানের জননীর এমন ব্যবহার মোটেই সমাজ-সঙ্গত নয়; তাছাড়া স্বামীর সঙ্গে যদি বিরোধ হয়ই তাহলে তৃতীয়পক্ষে কারুর কাছে সেই অসম্মানজনক পরিস্থিতি উপস্থিত না করে চেষ্টা করা উচিত স্বামীর সঙ্গেই, সংসারের সঙ্গেই সন্তোষজনক সমঝোতোয় পৌঁছবার। যে রেস্তোরাঁয় আরম্ভ করেছিল বাণী দান সেখানে সময় না কুলানোর জন্যে ওয়েলসলি স্ট্রীটে আরেক দোতলার খানাঘরে যেতেও আপত্তি করেনি মল্লিকার সঙ্গে বৃন্দাবন গোমেজ। কারণ শেষ পর্যন্ত তার এ আশা জ্যান্ত ছিলো যে এই প্রথম এবং এই

শেষ। কিন্তু বৃন্দাবন গোমেজ, শরৎচন্দ্রের পর যার চেয়ে জনপ্রিয় আর উত্তেজক কলম হাতে তুলে নেয়নি কেউ সেই বৃন্দাবন গোমেজের ছদ্মবেশের আড়ালে আদত মানুষ যে বাস করত মেয়েমানুষ চেনার যত গর্বই তার থাক মল্লিকাকে সে চিনতে পারেনি যে মোটেই তার প্রমাণ পাবার জন্যে চব্বিশ ঘণ্টাও পুরো অপেক্ষা কবতে হয়নি ; তার আগেই এসে গেছে মল্লকার চিঠি :

"প্রীতিলিয়েষু,—

আমার কালকের উত্তেজিত মুহূর্তগুলির জন্য আমি ভীষণ লজ্জিত [মুহূর্ত বানান মূল চিঠিতে ছিল মূহুর্ত, একজন মেয়েরই চিঠি যে এবিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ রাখেনি এই বানানই।] আমি একান্তভাবে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। আপনি ঠিকই বলেছেন বাঁচতে গেলে আমাদের সব রকম ডিসিপ্লিন মেনে চলতেই হবে। চলতে হবে সমাজকে মাশুল জুগিয়ে।—বিশেষতঃ আমাদের জীবন যখন বন্ধনে আবদ্ধ।

আপনার সাধু হৃদয়ের সরল অভিব্যক্তির কাছে আমি আমার ইমোশানাল মনের মাথা নীচু করে রাখলাম। আপনি ঠিকই বলেছেন। বন্ধুত্বের কাছে আর কোনও কিছু সম্পর্ক দাঁড়াতে পারে না ; আর সেরকম ক্ষণস্থায়ীভাবে মিলেমিশেও লাভ নেই। তারপর আমরা যেটাকে নিয়ে বড় হতে পারবো, জীবনে দাঁড়াতে পারবো সেই মধুর ও পবিত্র সম্পর্কটুকুই থাকুক আমার এবং আপনার চলার পথ আলো করে—আমার এই বিষাক্ত অবসাদে ভরা দুঃখময় জীবনের বাতায়ন দিয়ে আপনার পুণ্যময় মনের যে জ্যোতির্ময় আলোক এসেছে তা আমি অক্সিজেনের মতো আমার প্রতিটি নিঃশ্বাসের প্রাণকেন্দ্রে পূর্ণ করে রাখতে চাই।

জীবনে ঠকেছি অনেকবার। তাই ঠিকই করেছিলাম যে আর দুঃখ নতুন করে বাড়াবো না। কিন্তু এখন দেখছি আমার এই সৈনিক [বৃন্দাবন প্রথমে পড়েছিল সৈনিক ; পড়ে চমকে উঠেছিল।]

ভাব কাটাতে হলে এমনই কিছু শক্ত জিনিষ চাই যা গ্রানাইট পাথরের মতো শক্ত অথচ কোমল হবে। আজ দেখছি মানুষ পড়ে যাবার আগে বাঁচতে চায় wallএ হাত দিয়ে। আর এই wall আজো আছে বলেই আমাদের মতো ক্ষণভঙ্গুর মেয়েরা আবার বেঁচে উঠে দাঁড়াতে পারে। আপনি হলেন আমার সেই রক্ষক।

দুনিয়ায় অনেক রকম আজব জীব ঘুরে বেড়ায় যারা সুবিধাটুকুই নিতে চায়। আপনার সঙ্গে তাদের পার্থক্য এই যে, সুবিধা আপনি পেয়েও নিতে চাননি। সবার থেকে আমি আশ্চর্য হয়েছি আমার সম্বন্ধে আপনার সূক্ষ্ম সচেতন উক্তিগুলো শুনে। সত্যই আপনার চোখে আমি যা, আমার নিজের ধারণা অনুযায়ী আমিও ঠিক তাই। কি অপূর্ব সূক্ষ্ম অথচ সচেতন আপনার দৃষ্টিভঙ্গী। আপনার মহৎ হৃদয় দিয়ে আমার কালকেব ছেলেমানুষীগুলো ক্ষমা করুন। আব আমাকেও এই শক্তি আপনি দিন, যাতে আমি আমার মনের সমতা ঠিক রাখতে পারি।

তবে এটাও ঠিক যে, আপনি আজ যদি আমাকে এ্যাভয়েড করার জন্যে দূরে সবিয়ে দেন (আসল চিঠিতে দূর অবধারিত 'উ' ছিলো) তবে আমি আর কোনও দিনই বড় হতে পারবো না—পারবো না প্রতিষ্ঠিত হতে।

আপনি বলেছেন আমাকে নতুন করে সৃষ্টি করবেন (বলেছে নাকি বৃন্দাবন ? এই মেরেছে—)। আমিও কথা দিচ্ছি আপনার কথামত চলবো। আমার জীবনে এতখানি প্রভাব কেবল আপনার ব্যক্তিত্বের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। আমি সর্বান্তঃকরণে আমার মাথা নীচু করলাম—আমার জীবনের সবচেয়ে বড় বন্ধুর কাছে আরও একটা অনুরোধ,—আমার ছেলেমানুষী কথাগুলোর গুরুত্ব দেবেন না। বড় মানুষেরা যেমন ছোটদের কথায় হাল্কা হাসে, তেমন করেই নিন আমার কথাগুলো,—এই শুধু আমার বলার ; নতুন

করে আর কিছু বলার নেই আমার। তবে আমার মতো দুঃখী মেয়ে বোধ হয় এ পৃথিবীতে দুটো খুঁজে পাওয়া ভার।

আমার এ পঙ্গু জীবনের ক্লান্ত পদক্ষেপের মাঝে আমি শুনতে পেয়েছি একটি সুন্দর কণ্ঠস্বর, যা আমার ছন্নছাড়া জীবনের মাঝে একটা বৈশিষ্ট্য (আসলে as usual 'য'-ফলা ছিল না) এনে দিয়েছে। আমার কাছে তা সুন্দর সত্য ও লোভনীয়।

ঘর আমাকে বাঁধতে পারে নি; পথও আমায় টানতে পারেনি। শুধু এক গতিহীন জীবনের মন্থর-ধ্বনি অহরহ ডাক দিয়ে টেনে নিয়ে চলেছিল আমাকে—আমাকে নিয়ে অনেকের দুশ্চিন্তা, বিশেষ করে আমার গুরুজনদের। আজ মনে হয় আমার স্থিতিশীল ব্যবহারে তাঁরাও হয়ত সুখী হবেন; যদি এর মূলে (মূলে 'উ' কিন্তু!) কেউ থাকে তো সে আপনি। আজ যদি আপনি সরেও যান, আমি কিন্তু দেখবো আপনার নামের রাজসিংহাসন পাতা রয়েছে আমার দুঃখী মনের একটি কোণে।"

চিঠির মাথায় ঠিকানা-তারিখ অথবা চিঠির তলায় নেই কারুর স্বাক্ষর; তবু এ চিঠির প্রতি অক্ষরে যার নাম সই করা রয়েছে, তার তার নাম মল্লিকা। চিঠি পড়তে মল্লিকার গলার স্বর এসে দাঁড়িয়েছে বৃন্দাবনের সামনে বার বার। শুধু এসে দাঁড়িয়েছে নয়; সেই কণ্ঠস্বরের আদ্রর্তা শেষ পর্যন্ত ভিজিয়ে দিয়েছে বৃন্দাবনের কঠিন হৃদয়; তার নিরাসক্ত মনের রৌদ্ররুক্ষ মাটি। এবং সেই,—ফাঁদে পা দিয়েছে বৃন্দাবন। আবার স্বেচ্ছায় দেখা দিয়েছে মল্লিকাকে; সিনেমায়, রেস্তোরাঁয়, কলকাতার বাইরে কোথায় যায়নি তারা।

যদিও বৃন্দাবনের কাছে খবর এসে গেছে যে, মল্লিকার মনের সিংহাসনে অন্তত তেত্রিশ জন এর আগেই বসে গেছে; যে কখনই বসতে পায়নি, সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিই মল্লিকার স্বামী। কেবল মনের সিংহাসনে বসিয়েই তৃপ্তি পায়নি মল্লিকা; এর আগে ওই এক চিঠি সে ঠিক কতজনকে লিখেছে, তার সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব

না হলেও রীতিমতো শক্ত। বৃন্দাবন গোমেজের সেই প্রকাশক যার দোকানে মল্লিকার সঙ্গে তার প্রথম দেখা, সে একাই বিভিন্ন পাঁচজনকে লেখা ওই এক চিঠি প্রোডিউস করেছে অল্প বিরতির ব্যবধানে। এক চিঠি মানে,—শব্দ, অক্ষর, বানান ভুল পর্যন্ত এক; —কমা, সেমিকোলন, ফুলষ্টপের কথা না হয় বিস্মৃতই হওয়া যেতে পারে। এক চিঠির কাগজ; মায় চিঠির মাথায় ঠিকানা-তারিখ এবং তলায় স্বাক্ষরের অনুপস্থিতি পর্যন্ত এমন ট্রু কপি যে, কোনও ব্রিটিশ কোম্পানীর ঈর্ষাযোগ্য বেতনের কোনও কনফিডেনসিয়াল লেডি সেক্রেটারীরও নয় দীর্ঘদিনের নকল করার অভ্যাস পরবর্তী পেশাতেও করায়ত্ত।

এছাড়াও মল্লিকা তার বাড়ীর আভিজাত্য সম্পর্কে যা যা বলেছে, তার সবটাই বৃন্দাবন গোমেজের ভাষায় 'ম্যাপ'-ষ্টাইলে বলা; ম্যাপ-ষ্টাইল কথার অর্থ হচ্ছে বৃন্দাবন গোমেজের একান্ত নিজস্ব অভিধান অনুযায়ী এই যে, ম্যাপে যেমন এক ইঞ্চিতে বেশ কয়েক মাইল ধরতে হয় প্রায়ই, না হলে স্বল্পায়তন মানচিত্রে ধরা যায় না জল-স্থলের সুবিপুল পরিধির সঠিক চিত্র, তেমনই মল্লিকা তার বাড়ীর অতীত এবং বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে যা বলতে চেয়েছিল আসলে তার অবস্থা তার চেয়ে অনেক শোচনীয় হয়ে এসেছিল এবং কোনও দিনই মল্লিকার বর্ণনা-মাফিকের ধারে-কাছেও পৌঁছতে পারেনি; এসব সত্ত্বেও মল্লিকাকে 'না' বলতে পারেনি বৃন্দাবন গোমেজ; কিন্তু একটা সময় এলো যখন বৃন্দাবন গোমেজ বলতে বাধ্য হলো যে সে বৃন্দাবন গোমেজ নয়। মল্লিকার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে শেষ পর্যন্ত হাতে তুলে নিতে হলো পাশুপাত অস্ত্র। একটা ব্যাপার বুঝতে দেরী হয়নি বৃন্দাবনের; মল্লিকার মনের সিংহাসনে যাদের বসিয়েছে সে, তারা প্রায় প্রত্যেকেই হয় গায়ক; নয় লেখক; নয় জীবনের আর কোনও ক্ষেত্রে রীতিমতো নায়ক। কিন্তু তারা সবাই বৃন্দাবন গোমেজের উপস্থিতিতে জ্যোৎস্নালোকে

তারাদের মতোই নিষ্প্রভ। আর সেই কারণেই বৃন্দাবন গোমেজের কাছে মনের দরজা আরেকটু খুলে দিয়েছিল মল্লিকা; দিতে বাধ্য হয়েছিলো।

এইখানে এসে আগের একটা কথা প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা না করে দিলে পাঠিকার বিচারে মল্লিকার চেহারার বর্ণনা অসত্য বলে ঠেকতে পারে, আর নয় মল্লিকার মনের দরজায় এত লোকের হানা মনে হতে পারে মিথ্যে বলে। রূপ অথবা বয়স কোনটাই মল্লিকার অনুকূলে ছিল না ঠিক, তবু কেন তার সঙ্গ প্রত্যাখান করতে পারেনি বৃন্দাবন গোমেজও তার কারণ আপাতদৃষ্টিতে প্যারাডক্স বলে প্রতীয়মান হলেও আসলে তা নয়। আসলে পুরুষমানুষ মেয়েমানুষ সম্পর্কে সব চেয়ে মিথ্যে বলে তখন যখন সে বলতে চায় কোনো কুশ্রী মেয়ে নিজে থেকে এসে দাঁড়ালেও পুরুষ যথেষ্ট প্রলুব্ধ হয়না। এমন কোনও মেয়ে নেই দুনিয়ায় এত কুরূপা যে ডাকলে না বলতে পারে কোনও কোনও বেটাছেলে। আর সেই সঙ্গে এও সত্য যে, এমন কোনও অপরূপ লাবণ্যর আজও মেলেনি দেখা কিছুকাল বাদে যার রূপযৌবন-সান্নিধ্য মনে হয়নি দুঃসহ রকমের ক্লান্তিকর সব চেয়ে অযোগ্য অপদার্থ স্বামীর অথবা পরপুরুষেরও। এই দুই-ই যত পরস্পর-বিরোধই হোক,—দুই-ই সমান সত্য।

একটা সময় শেষ পর্যন্ত এলো, যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লো বৃন্দাবন গোমেজ। আর ঠিক এই সময়ই মল্লিকা-বৃন্দাবন নাট্যের মাঝপথে প্রবেশ করলো এই কাহিনীর মূল গায়েন,—অর্জুন সিং। অর্জুন সিং-এর ট্যাক্সীতে বসে প্রথম দিনেই চলেছিলো বৃন্দাবন-মল্লিকা সংলাপের পূর্বানুবৃত্তি। কথাবার্তার ধরণ শুনে অর্জুনের কাছে জলজ্যান্ত হয়েছিলো যা আরম্ভেই তা হচ্ছে, বৃন্দাবন ট্যাক্সীতে ওঠবার আগেই ছুঁড়ে দিয়েছে তার পাশুপাত। অর্থাৎ মল্লিকাকে ত্যাগ করবার মুহূর্ত হয়েছে বাঙলা ছবির বিজ্ঞাপনের ভাষায়ঃ

আসন্ন। সেই কথারই জের চলেছিলো অর্জুন সিংএর ট্যাক্সীতে প্রথম সন্ধ্যায়।

প্রথমে মল্লিকা বিশ্বাস করেনি বৃন্দাবনের কথা। কিন্তু কোনও এক সময়ে তর্কের পিঠে তর্ক করতে করতে বৃন্দাবন যখন সাঙ্ঘাতিক নরম করে এনে গলা মল্লিকাকে বোঝালো যে এতদিন দাঁড়কাক হয়ে ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করেছে সে শুধু মল্লিকার মধুর সঙ্গ-কামনায়, এখনই সেই পাপে বিবেক-দংশনে ক্ষত-বিক্ষত হতে হতে এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে সে যে, এ স্বীকৃতির ফলে মল্লিকাকে সুনশ্চিত হারাবে জেনেও আর উপায় নেই তার ময়ূরপুচ্ছ ফেলে দিয়ে সে যা সে তাই হয়ে না আত্মপ্রকাশ করে,—তখন সেই কণ্ঠস্বর কারুর কানে এবং সেই অভিব্যক্তি কারুর চোখে গেলে যে কেউ মেনে নিতে বাধ্য হতো যে বৃন্দাবন লেখক না হয়ে অভিনেতা হলেও হুলুস্থুল আসতে পারত জগতের যে কোনও মঞ্চে। মল্লিকার মনের অডিটরিয়মেও তা ডিসায়ার্ড এফেক্ট আনতে ব্যর্থ হলো না।

আসল বৃন্দাবন গোমেজ অবশ্যই এই নকল বৃন্দাবন গোমেজের অভিন্ন-হৃদয় অন্তরঙ্গ এবং তার সঙ্গে মল্লিকার সে সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দেবে যদিও তা ঘটানো যে কারুর পক্ষেই প্রায় দুঃসাধ্যের পর্যায় পড়ে, জানাবার পর এবং কথা দেবার পর যে করেই হোক তার সঙ্গে মল্লিকার দেখা করিয়ে দেবেই নকল বৃন্দাবন, তবেই আসল বৃন্দাবন গোমেজকে নকল বৃন্দাবন গোমেজ বলে বিশ্বাস করে রেহাই দেবার জন্যে সেদিনকার ট্যাক্সী থেকে শেষ পর্যন্ত এক সময়ে নিষ্ক্রান্ত হলো মল্লিকা, বাড়া আসবার সিকি রাস্তা বাকী থাকতেই।

মল্লিকা নেমে যেতে নিদারুণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে বৃন্দাবন গোমেজ; পকেট থেকে বার করলো সিগারেটের প্যাকেট; দেশলায়ের বাক্সে একটি মাত্র কাঠি। সাম্প্রতিক কালের মধ্যে জাগ্রত অবস্থায় সিগারেট খেতে বিস্মৃত হওয়া এতক্ষণ ধরে এই প্রথম ধূমপানের তেষ্টায় ফেটে যাচ্ছে বুকের ছাতি। দেশলায়ের

একটি কাঠি, সে দরজার নীচে মুখ নামিয়ে নিয়ে গিয়ে অনেকটা সন্তর্পণে জ্বালা বৃন্দাবন। ঠিক মত জ্বলতে দেখে ভারী খুশি হলো, ঠোঁটে লাগানো সিগারেটটা হঠাৎ,—না, দমকা হাওয়া নয়, ট্যাক্সী ড্রাইভারের সীট থেকে বিশুদ্ধ বাঙলায় প্রশ্ন উঠে এলো বসবার আসনে : এই মেয়েটিকে কতদিন চেনেন আপনি ?

দেশলায়ের একমাত্র জ্বলন্ত কাঠিটা দপ করে নিভে গেল। একটি দৃশ্যের পব আরেকটি দৃশ্যে পৌঁছতে ঘূর্ণায়মান মঞ্চে নেমে আসে যে অন্ধকার নীরবতা, তারই মতো কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধ বিরতি ঝুলতে লাগলো ড্রাইভাবের আর প্যাসেঞ্জারের আসনের মধ্যে। একটু বাদে কঠিন শীতল কথা না-বলাব বরফ ভাঙ্গলো অর্জুন সিংই : এই নিন—। নতুন দেশলায়ের একটা বাক্স; তখন মুখের বাঁধন মুক্ত হয়নি। দেশলায়ের বাক্সের কৌমার্য-রজ্জু ছিন্ন করে, কখন্ ঠোঁটে ধরে থাকা লালায় ভিজে যাওয়া সিগারেটের মুখে আগুন দিয়েছে জানে না বৃন্দাবন; দেশলায়েব বাক্সটা ফেরত নিতে নিতে পেছনে না তাকিয়ে অর্জুনই আবার বলে : আমার নতুন দেশলায়েব বাক্সটা রেখে দিয়ে মধ্যবিত্ত বাঙালীর পকেটের মতো খালি আপনার দেশলায়ের বাক্সটা দেননি তো ? দেখবেন স্যর,—যে-রকম প্যাঁচে পড়ে গেছেন আপনি,—মাথাব ঠিক নেই তো,—তাই বলছিলাম, কিছু মনে কববেন না। এবার কোন্‌দিকে যাবো ? বাঁদিকে নিশ্চয়ই—।

অনেক কষ্টে বিস্ময়ের সমুদ্র সাঁতবে, অনেক কষ্টে সে কথাটা শেষ পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারলো বৃন্দাবন, তা কিন্তু অর্জুন সিং যে প্রসঙ্গে একগাদা শকের পর শকের তরঙ্গ তুলেছিল নিস্তব্ধতাব ডোবায় একটিমাত্র প্রশ্নের ঢিল ছুঁড়ে, তার ধার-কাছ দিয়েও গেল না; তার বদলে বৃন্দাবনের গলা দিয়ে যা বেরুলো তা হচ্ছে : তুমি বাঙলা জানো—?

প্রশ্নের পিঠ-পিঠ ফিরে এলো প্রত্যুত্তরের বুমেরাং : আপনার

মতো জানি বললে ঔদ্ধত্য হয়ে পড়বে ক্ষমার অযোগ্য, তবে আপনাদের অনেক বাঙালীর চেয়ে ভালোই বাঙলা বলি বোধ হয়—; বৃন্দাবন যতক্ষণে ভাবছে কোনদিকে মোড় নেওয়াবে এবারে, তার কথাকে, অর্জুন ততক্ষণে সুরু করে দিয়েছে আবার: বাঙলা জানাটা আমার খুব আশ্চর্যের কিছু নয়; সেই এত্তোটুকু বয়স থেকে আপনাদের এই কলকাতাতেই কি না। বরং নিজের ভাষায় কথা বলতে গেলেই এখন ভয় হয়, বুঝি সব গুলিয়ে ফেলবো।

প্রথম শকের ধাক্কা ততক্ষণে সামলে উঠেছে বৃন্দাবন; অনেক সহজ হয়েছে সে এতক্ষণে; প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তন করতে তার তখন আর মুহূর্তমাত্র: এ মেয়েটিকে তুমি জানো না কি? আওয়াজ করে মস্ত বড় আপত্তি জানায় অর্জুন: কি যে বলেন! দেবা ন জানন্তি, কুতো মনুষ্যাঃ; মেয়েমানুষকে জানা মানুষের সাধ্য নয়; তবে চিনি এঁকে। এঁর হাই-হিল সোয়েডের ধূলো অনেকবার এ গাড়ীতে পড়েছে যে—।

বৃন্দাবন গোমেজের সঙ্গে সেই মুহূর্তে থেকেই জমে ওঠে অর্জুন সিং-এর।

মল্লিকা নয় একা; মল্লিকার ছুটি বন্ধু অন্ততঃ অর্জুন সিংএর গাড়ীকে ধন্য করেছে ইতোপূর্বেই। সেকথা অর্জুন আমাকে সবিস্তারে জানিয়েছিলো; কিন্তু বৃন্দাবন-মল্লিকা নাট্যের সঙ্গে তার যোগ নির্বাচন জেতবার পর কি বাম কি দক্ষিণপন্থী নেতাদের সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগের চেয়ে বেশী নয়; তাই সেকথা আপাততঃ শিকেয় তুলে রেখে যে-কথা এখন পাড়া যেতে পারে, সচ্ছন্দে তা হচ্ছে বৃন্দাবন গোমেজকে কেমন করে মল্লিকার হাত এড়াতে হবে তারই যে একটি চমৎকার মতলব অর্জুন সিং দিয়েছিল সেদিন সেই আশ্চর্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের আশ্চর্যতর পরিণতি—আসলে যা এ কাহিনীর একমাত্র ও যথার্থ উপসংহার।

অর্জুন বললো: এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন? কাউকে খাড়া করে

দিন বৃন্দাবন গোমেজ বলে। ইউরেকা বলে লাফিয়ে উঠতো বৃন্দাবন গোমেজ আর্কিমিডিস হলে; কিন্তু সে বৈজ্ঞানিক নয়,—সে শরতোত্তর বঙ্গসাহিত্যের জনপ্রিয়তম কলম; সে তাই চেঁচিয়ে উঠলো ঃ এ তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে এলে চুণীলাল? তারপর আর বৃন্দাবন গোমেজের মনে পড়লো না একবারও যে, সে অর্জুন সিংএর ট্যাক্সীতে বসে আছে; তার মনে ফিরে গেল দশ বছর আগে শেষ দেখা তাতা মজুমদারের কাছে। তাতা-ই একমাত্র সাজতে পারে বৃন্দাবন গোমেজ। শুধু সাজতে পারে যে তাই নয়, মেয়েছেলের জন্যে এমন কোনও কাজ নাই যা না করতে পারে তাতা মজুমদার। দশ বছর আগে শেষ দেখা, তবু বৃন্দাবন গোমেজ জানে যে আরও বিশ বছরও যদি দেখা না হয় তাতার সঙ্গে তাতা তবুও তাতা-ই থাকবে। বয়সের ভারে হবে না একটুও ঠাণ্ডা। বৃন্দাবন গোমেজের ভূমিকায় তাতা মজুমদার নামলে বৃন্দাবন গোমেজের পক্ষেই স্বয়ং ধবা শক্ত হবে যে সে বৃন্দাবন গোমেজ নয়; তাতা মজুমদার।

দি আইডিয়া! তাতা মজুমদাবই মল্লিকার একমাত্র জবাব হবে।

দশ বছর আগে কলকাতার প্রাণ, Life and Soul of Gay Calcutta ছিলো যে তারই সর্বজন পরিচিত নাম ছিলো; তাতা মজুমদার; তাতা তার আসল নাম নয়; ডাকনাম। কিন্তু ডাকনামেই তার নামডাক। তার আসল নাম পুণ্ডরীকাক্ষ; সে নাম বললে সম্ভবতঃ তার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়-স্বজনরাও চিনবে না। কিন্তু তাতা বললে একডাকে চিনবে না যে সে কলকাতা দেখেছে, কিন্তু হাইকোর্ট দেখেনি তখনও। তাতা মজুমদারের কথা মনে পড়তেই মন একটু খুশি হব হব কচ্ছে, এমন সময় অর্জুন সিং-ই আবার বিস্ময়ের বিস্ফোরণ ঘটালে; এবারটার জন্যে সত্যিই বৃন্দাবন তৈরী ছিলো না।

কাকে বৃন্দাবন গোমেজ সাজাবেন তা নিয়েই বা ঘাবড়াচ্ছেন

কেন? তাতা মজুমদারকে মনে পড়ে আপনার? তাকে দিয়ে তো চমৎকার চলে বৃন্দাবন গোমেজ বলে চালানো। চলে না?—অর্জুন সিংএর সহাস্য জিজ্ঞাসায় হয়ে গেছে তখন বৃন্দাবনের। বলে কি?—লোকটা জ্যোতিষী না কি? না,—আই বি-র লোক? নড়ে-চড়ে বসে বৃন্দাবন গোমেজ রীতিমতো। তার গল্পের পাত্র-পাত্রীদের মুখে বসানো সংলাপ শুনে লোকে বাহবা দেয়; কিন্তু অর্জুন সিংএর মুখে যা শুনলো এইমাত্র তাতে এতদূর বিস্মিত বৃন্দাবন যে বাহবা দিতেও সে ভুলে গেল।

তাতা মজুমদারকে তুমি চেন না কি হে?

কে না চেনে স্যর, তাতা মজুমদারকে? কলকাতা শহরে যারা ট্যাক্সী চালায় তাদের মধ্যে কে আছে এমন?

আমার সঙ্গে তার আলাপ আছে তাও জানো?

জানি; আজ দশ বছর ধরে তাতাবাবু যখনই এ গাড়ীতে উঠেছেন তখুনি কোনও না কোনও সময়ে এসে পড়েছে আপনার কথা। আপনি কিভাবে হাঁটেন, কথা বলেন, লেখেন, সিগারেট ধরান, নিজের মনে বিড়বিড় করে কি বলেন—সব। আপনাকে দেখা আমার হয়ে গেছে; আপনার পার্টে তাই তাতা মজুমদার একটুও বেমানান হবে না যে একথা আপনার মতো আমারও জানা; তাই কাকে বৃন্দাবন গোমেজ সাজানো যায় ভাবতে গিয়ে যখন আপনার এবং আমার দু'জনেরই একসঙ্গে তাতার কথা মনে পড়েছে তখন তাতা মজুমদারের স্মরণ নেওয়া যাক—

কোথায় পাই তাকে এখন?

কটা বাজে জিজ্ঞেস করল বৃন্দাবনের প্রশ্নের উত্তরে অর্জুন সিং।

হাতঘড়ি দেখবার জন্য সিগারেটে জোর টান দিয়ে তার আলোয় জবাব দিল বৃন্দাবন। সাড়ে আট। তাহলে পাবেন ওয়েলিংটন স্কোয়ায়ের উল্টোদিকে এম্পায়ার বার-এ।

তাতা মজুমদার। মল্লিকার সঙ্গে ম্যাচ করবে চমৎকার; দু'জনে মিলে যেন একজোড়া গ্নাভস্। তাতাও মোটা, বেঁটে, বেঢপ। গায়ের রঙ এত কালো যে তার সম্বন্ধে গল্প আছে মজার। বিলিতী দ্রব্য বয়কটের দিনে তাতা বলে তাতাকে নাকি একবার বাস থেকে নামিয়ে দেয় বাসের লোকজন জোর করে; কারণ কি জিজ্ঞেস করলে তারা নাকি তাতার গায়ের রঙ লক্ষ্য করে বলে; This bus is not meant for Europeans.। তাতার চাকরী পদ্মপাতার জল। এই আছে, এই নেই। তাতা আজ পর্যন্ত যত জায়গায় ঢুকেছে, তাতাব বন্ধুরা অতিশয়োক্তি করে বলে, তাতা চাকবী ছেড়ে দিযে বেরিয়ে এসেছে তাব চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশী কর্মস্থল থেকে। দু'টি জিনিষে শুধু ষ্টিক করে আছে সে; দুই বস্তুরই আদ্যাক্ষর 'ম'; মদ আব মেয়েছেলে। তাতা মজুমদাবকে মনে পড়লে আরও একটা কথা অবশ্যই মনে পড়ে যাব আদ্যাক্ষবও ওই 'ম',—মজবুত; তাতার কথার মাত্রাই ছিল মজবুত। পয়সা হাতে পডলেই সঙ্গে সঙ্গে তার পেটে পড়া চাই কিছু; রীতিমতো টানবার পরও তাতাকে টেনে আনা যেত না; তাতা বলত: দাঁড়াও, মজবুত কবে আব এক পাত্তর টেনে তবে উঠবো। মেযেছেলের ব্যাপাবেও তার বিখ্যাত খেদোক্তি আজীবনের: মজবুত করে প্রেম কবা গেল না জীবনে একবারও।

যারা বলে, পুরুষালী বিরাট চেহারা না হলে চোখে ধরে না মেয়েদের, তারা মেযেছেলে কি এবং কে জানে না, ওই সঙ্গে তাতাকেও। তাতার চেহারা বমণীমোহন পুরুষ থেকে এত দূরে যে, স্পুটনিক যেদিন চাঁদে ল্যাণ্ড করবে সেদিনও অনতিক্রম্য রইবে এই ব্যবধান। কিন্তু তাতার সঙ্গে চোখোচোখি হবার পর আজ পর্যন্ত কোন মেয়ে এড়াতে পারেনি তাকে। তাতার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বেরুতে হবেই তাকে। এবং মেয়েদেব ব্যাপারে আদ্বিজচণ্ডালকে কোল দিতে তাতার মনে কখনও এতটুকু দ্বিধার

অথবা সংস্কারের ছায়া পড়েনি তার অত্যন্ত উদার মনের অনাচে-কানাচে কখনও। তাতাকে দেখলে জীবনে কোনও রমণীর হৃদয় হরণ দূরে থাক, ধারে-কাছেও ঘেঁসবার সুযোগ সৃষ্টি করতে পেরেছে একথা হলফ করে বললেও যে কারুর পক্ষেই বিশ্বাস করা শক্ত হবে। কিন্তু তাতা একাধিক মেয়েব সান্নিধ্য নয় শুধু ছিনিমিনি খেলার অবাধ বাণিজ্যের মনোপলি ভোগ করেছে তাদের সঙ্গে, বিশ্বাস-ঘাতকতা করবার দীর্ঘকাল বাদেও সুদীর্ঘকাল ধরে। একটি নমুনার ভাত এখনই টিপে ধরলেই বমণীয় মনের কনোসিয়র বলে যারা দাবী করে তাদের পক্ষে বলা সহজ হবে তাতা এ ব্যাপারে সিদ্ধপুরুষ কি না।

বিদেশীনি এক মার্জাবনয়নার সঙ্গে নীল আকাশেব নীচে কার্জন পার্কের অন্ধকারে না পুবো শুয়ে, না পুরো বসে গল্প করছে তাতা মজুমদার। তার জীবনের দুঃখের গল্প। একসময়ে চাকরী না থাকাব ফলে দিনের পব দিন কেমন কবে কলের জলে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দুই দূর কবে পার্কের বেঞ্চিতে শুয়ে বাত কাটিয়েছে তাতা, তারই হৃদয়-বিদারক কাহিনী। বলতে বলতে তাতা এনে ফেলেছে গল্পকে এমন মোড়ে যেখানে তার বক্তব্য হচ্ছে সাদা বাঙলায় এই যে, এমন সময় সামান্য একটা কাজের সুযোগ এসে দাঁড়াতেই তাতা ঝাঁপিয়ে পড়েছে সঙ্গে সঙ্গে। তাতা সেই কথাটা বোঝাবার জন্যে বলেছে ঃ “and I grabbed that little job” আর হাত পা নেড়ে illustrate কবতে গিয়ে জড়িয়ে ধবেছে বিদেশীনিকে, ধরেছে তাকে একেবারে মজবুত করে, যেন বিদেশীনিই সেই little job যাকে সে grab করেছে এইমাত্র। তারপর যেন অন্যায় করে ফেলেছে এমন ভাবে মুখ করুণ করে এনে তাতা বলছে ঃ I am extremely sorry—! বিদেশীনি মিস নরম মিষ্টি গলায় সাড়া দিয়েছে ; Its all right! Go on pleaase—!

এই তাতা দশবছর বাদেও সেই তাতা-ই আছে মনে করে

বৃন্দাবন গোমেজ ইম্‌পিরিয়াল বার-এ গিয়ে প্রথমে দারুণ ধাক্কা খেলো; তাতা মজুমদার আর সে তাতা মজুমদার নেই। না। গায়ের রঙ সেই ইয়োরোপীয়ান থার্ডই আছে; মাল খাবার বহরও কমেনি বিন্দুমাত্র। কিন্তু হলে হবে কি, মূলেই হাবাত হয়ে গেছে তাতা; বিয়ে করে বসে আছে সে বৃন্দাবনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার প্রায় বছর দুয়েকের মধ্যেই। শুধু কি তাই? তিন-তিন ছেলের বাপ হয়ে বসে আছে তাতা; তাকে দিয়ে আর যাই হোক, যে-কাজে বৃন্দাবন সেদিন এসেছে তা কি আর সম্ভব?

টেবলের ওপর প্রচণ্ড ঘুঁসি মেরে চীৎকার করে উঠেছে অবশ্য তাতা বৃন্দাবনের আগমনের কারণ শুনে: আলবাৎ সম্ভব। সেকালে যে অশ্বমেধ যজ্ঞের কারণে বেরুনো অন্য লোকের অশ্ব ধরে নিয়ে আসত দিগ্বিজয়ী নৃপতিরা, সে কি তাদের নিজেদের অশ্ব ছিলো না বলে? না—জয়ের নেশায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হতো বলে? বিয়ে করেছে তাতা মজুমদার; তিনছেলের বাপ এবং যথেষ্ট বয়েস হয়েছে; ঠিক। মেয়েটিও বৃন্দাবনের মতে যথেষ্ট বয়সী এবং মোটেই সুশ্রী নয়; হোক। কিন্তু তাতে পরস্ত্রীর সঙ্গে মজবুত করে প্রেমের এমন সুযোগ ছেড়ে দেবে যে, তার নাম আর যাই হোক তাতা নয় কোনও দিন। না; কিছুতেই না। বৃন্দাবন গোমেজই সাজবে সে। তাতা মজুমদার আর পাঁচজনের মতো সেদিন অজানা করনারী থ্রম্বসিসে নয়; তাতা যাতে মারা যেতে চায় তার নাম পরনারী থ্রম্বসিস।

শেষ পর্যন্ত তাতা মজুমদার পরের বুধবার সন্ধ্যে সাতটায় বৃন্দাবন গোমেজের ভূমিকায় নামতে আসবে হাজরা রোডের মোড়ে, ঠিক হলো; অর্জুন সিংএর ট্যাক্সীতে মল্লিকাকে নিয়ে অপেক্ষা করবে বৃন্দাবন গোমেজ।

বুধবারের সেই সন্ধ্যে সাতটা ঘড়িতে পৌঁছবার আগেই; অনেক আগেই অর্জুন সিং-এর ট্যাক্সীতে পা দিয়েছিলো যে

সেদিন বৃন্দাবন, মল্লিকার সঙ্গে উপস্থিত না থেকেও তা আমরা জানি। ছটফট করছিলো সাড়ে ছটারও আগে থেকে অর্জুন সিং-এর ট্যাক্সীতে যে মল্লিকার চেয়ে অনেক বেশী, বৃন্দাবন গোমেজ তারই বিখ্যাত ছদ্মনাম ছিলো সেদিন। তীরে এসে তাতা না তরী ডোবায়, এ দুর্ভাবনায় দারুণ পীড়িত হচ্ছিলো তার মন ঘড়ির কাঁটা যত সন্ধ্যে সাতটার দিকে এগুচ্ছিলো এক-পা এক-পা করে। বুকের মধ্যে হাতুড়ীর ঘা পড়লো সেই মোড়ের পানের দোকানের পেটা ঘড়িতে টং টং করে একবারও না থেমে যখন দ্রুত বেজে গেল সাতবার। তাতা মাল খেয়ে নিশ্চয়ই বেসামাল হয়ে পড়েছে কোথাও। এখন উপায়?

অর্জুন সিং-এর গাড়ী থেকে নেমে গেলো বৃন্দাবন: কিছুটা যদি এদিক-ওদিক কোথাও দাঁড়িয়ে থাকে অর্জুনের ট্যাক্সী ঠিক মতো স্পট করতে না পেরে, সেই hope against hope সম্বল করে আর কিছুটা সেই মুহূর্তে কিংকর্তব্যবিমূঢ় বৃন্দাবন মল্লিকাকে এভয়েড করতে পারলে যদি মাথায় কোনও মতলব খেলে সেই দুরাশায়। মোড় থেকে পঁচিশ গজ আলিপুরের দিকে এগুতেই পালস্ ফিরে এলো বৃন্দাবনের; সামনেই সব কটি দাঁত বার করে দণ্ডায়মান তাতা মজুমদার, আদি ও অকৃত্রিম। দেরীর জন্যে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বৃন্দাবনকে তাড়া দিলো তাতা, চল চল: এসেছেন ভদ্রমহিলা?

অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিলো অর্জুনে সিং-এর ট্যাক্সী। তাতাকে গাড়ীর কাছে নিয়ে গিয়ে বৃন্দাবন ইনট্রোডিউস করলো, এই আমার বন্ধু বৃন্দাবন—; উল্টোদিক থেকে একটা গাড়ী সাঙ্ঘাতিক জোরালো হেডলাইটের আলো ফেললো অর্জুন সিং-এর ট্যাক্সীর চতুর্দিক বেড়ে। আর মল্লিকা তাতা মজুমদারকে দেখে আর্তনাদ করে উঠলো: তুমি?

বৃন্দাবন গোমেজ ফিরে দেখলো তাতার দুর্জয় কালো রঙের মুখ

মড়ার মত সাদা; বৃন্দাবন এরপর কখন জিজ্ঞেস করেছিলো তাতাকে: চেনো নাকি তুমি?—এবং তাতা কখন তার জবাবে বলেছিলো: হ্যাঁ; মল্লিকা আমার স্ত্রী।'—সে কথা গোমেজের আর সঠিক মনে নেই।

আমার এখনও মনে আছে; মনে আছে যে অর্জুন সিং এই কাহিনী বিবৃত করবার পর আমি একটি প্রশ্ন তাকে না করে কিছুতেই পারি নি: অর্জুন, একটা কথার ঠিক জবাব দেবে? নিস্পৃহ কণ্ঠে উত্তর আসে: বলুন। গলার স্বর শুনে বুঝতে পারি অর্জুন আন্দাজ করতে পেরেছে আমার জিজ্ঞাসা; তবুও বলেই ফেলি শেষ পর্যন্ত: আমার একটা কথা মনে হচ্ছে তোমার মুখে আদ্যন্ত এই দুর্ঘটনা শোনবার পর যে, বৃন্দাবন গোমেজ না জানুক তুমি নিশ্চয়ই জানতে এ্যাট লিষ্ট যে তাতা আর মল্লিকা পরস্পর স্বামী-স্ত্রী।—জানতে কি না সত্যি বলো?

বৃন্দাবন আমার কথার জবাব দেয় না; চিরা-চরিত তাকায় তার মিটারের দিকে; তার চোখকে অনুসরণ করে আমার চোখও যে-কথা পড়তে ভোলে না, তাই হচ্ছে এ কাহিনীর পরিচয় টীকা: ট্যাক্সীর মিটার উঠছে।

উত্তরমেঘ

অজুর্ন সিংএর যে গল্পটি অতঃপর বলতে যাচ্ছি সেটি আমার গ্রন্থণায় দ্বিতীর স্থান অধিকারে কেউ যেন একথা না মনে করেন, তার কারণ বুঝি অর্ডার অফ মেরিট : না। বরং কোনও পাঠিকার চোখে অর্জুনের এই দ্বিতীয় অভিজ্ঞতাই, আসলে অদ্বিতীয় এক আকর্ষণ বলে ঠেকতে পারে অনায়াসেই কোনও মতদ্বৈধের এতটুকু অবকাশ না রেখে, অথবা সামান্যতম সংস্থান ছাড়াই। অর্জুন সিংএর ইতিবৃত্তের সিন্দুক থেকে বার করে এনে এবার যে দু'টি রত্নকে সর্বসাধারণ্যে তুলে ধরতে যাচ্ছি, এক সময়ে তারা অভিনয় জগতের রত্ন বলেই সত্যি সত্যি বিবেচিত হতো ; আমি সে যুগের বিখ্যাত যুগল শঙ্করদাস মুখুজ্যে এবং নলিনী দাসীর কথাই বলছি। সেদিনকার কলকাতা থিয়েটারে সোনায় সোহাগা যোগ বোঝাতে শ্রীগৌরাঙ্গ পালার নাম-ভূমিকায় শঙ্করদাস এবং শচীমাতার অংশে নলিনী দাসীকেই বোঝাত। পুরাণো সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় ব্রজেন বাঁড়ুজ্যের সিকির সিকি ধৈর্য, পরিশ্রম ও নিষ্ঠা ছাড়াই শঙ্কর-নলিনীর যুগল দিগ্বিজয়ের সচিত্র বিবরণ যে কোন চোখেই এখনও জ্বলজ্বল করে উঠবে দু'চার পাতা ওল্‌টাতে না ওল্‌টাতেই ; যদি কেউ অন্ধ হয়, সম্ভবতঃ তীব্র স্পর্শ-চেতনার কারণে তার দৃষ্টিতেও ব্যতিক্রম হবে না এর।

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত উচ্ছ্বাসকে যদি কেউ অন্ধ অনুরাগের নমুনা বলে নাক সিঁটকোয়, তাহলে তাদের অবগতির জন্যে অবশ্যই সেইসব লোকদের কাছে যেতে হবে, যাদের আজ অনেক বয়েস হয়েছে কিন্তু আজও যারা বেঁচে আছে সেই যুগলাভিনয় প্রত্যক্ষ করবার দুর্লভ গৌরব সম্বল করে। এদের কাছে শঙ্কর-নলিনীর

কথা তুললে আজও, এদের প্রায়-নিঃশেষ চোখের দৃষ্টি এখনও দ্বিগুণ দীপ্তিতে জ্বলে ওঠে; আর উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে বাঁধ-না-মানা কথার নির্ঝরিণী। অবশ্য একথা ঠিক যে, তারা যখন বলে ওই বিখ্যাত যুগলের তুলনায় আজকের যে কোনও কম্বিনেশন চন্দ্রালোকের তুলনায় নিওনশাইন অর্থাৎ নেহাৎই অকিঞ্চৎকর, তখন তাদের বাগ্‌ধারা সেই অসুখে নিশ্চয়ই সাময়িক পীড়িত হয় বৈয়াকরণিকদের পরিভাষায় যার সংজ্ঞা: অতিশয়োক্তি দোষ। ঠিক। অতীতকে সমালোচনার অতীত মনে করে আর সমসাময়িক অথবা আগামীকালকে তার প্রাপ্য থেকেও যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর বঞ্চিত করে আত্মপ্রসাদ লাভ করার ব্যারাম আজকের নয়, চিরকালের; কোনও বিশেষ জায়গার গুণ নয়; সব দেশেই এর অল্প-বিস্তর উপস্থিতি সংখ্যাতত্ত্বর প্রমাণ ছাড়াই সত্য। সম্ভবতঃ, গোটা মানুষ জাতটারই পৈত্রিক সম্পত্তি সম্ভবত এই একটাই; সব মানুষেরই হেরিডিটরি রোগ হচ্ছে, সে কালের তুলনায় এ কালকে ছোট করা কারণে-অকারণে।

কিন্তু তবুও এই বল্গাহীন বক্তব্যের কথা ছেড়ে দিলে খুব ধর্তব্যেব মধ্যে না ধবলেও একথা উড়িয়ে দিয়ে লাভ নেই, যা রটে তার খানিকটা বটে; সবটাই তার মেকী নয়; কিছুতেই নয়।

উল্টোপাল্টা; বিরূপ মন্তব্য আর বিপুল উচ্ছ্বাসের মধ্যে 'মীন' কষলে যে অঙ্ক পাওয়া যাবে তা হচ্ছে সেই দু'জন অভিনেতৃ শঙ্করদাস মুখুজ্যে আর নলিনী দাসীর যুগল রূপদান যথাক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গ এবং শচী-মাতার ভূমিকায় দর্শকচিত্ত জয় করেছিল। আপামর জনসাধারণের, আবালবৃদ্ধ-বনিতার মনে কেটে বসে গিয়েছিল যে, সেই জীবন্ত অভিনয়ের দাগ এ বিষয়ে সন্দেহ করবার যদি কারুর এতটুকু কারণ থেকে থাকে, তাহলে বলা যেতে পারে যে, তা বিদ্বেষ প্রসূত; যুক্তিসংগত নয়। আজকের নিওরিয়ালিষ্টিক পাঠশালার আন্তর্জাতিক পুরস্কার-প্রাপ্ত ছবি অথবা নবনাট্য আন্দোলনের

মুখপাত্র কোনও নাটকের মতো কেবলমাত্র বিদুষীদের হৃদয়হরণ করাকেই (বাঙলা ছবি অথবা নাটকের দর্শক এখনও লোক নয়; স্ত্রীলোক) অভিনয়ের পরাকাষ্ঠা বলে মেনে নেওয়া অসম্ভব ছিল যে যুগে, সেই সময়েই শঙ্কর-নলিনীর অভিনয় একই সঙ্গে জনপ্রিয় এবং বিদ্বজ্জনপ্রিয় হতে পেরেছিল যে, কোনও প্রমাণই এখনও পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে রায় দেবে না,—এ বিষয়ে সেই একমাত্র নিরপেক্ষ অন্ততঃ নিঃসন্দেহ, যার আরেক নাম: ইতিহাস।

শঙ্কর এবং নলিনীর ক্ষেত্রে; বিশেষ করে, শঙ্কর দাসের ক্ষেত্রে উচ্ছ্বাসের ঝড় হৈ হৈ করে ওঠার কারণ ছিল। শ্রীগৌরাঙ্গের ভূমিকায় যে কারুর পক্ষে অবতীর্ণ হওয়া সেদিন ছিল দুঃসাহসিকতম কাজের চূড়ান্ত। তার আগে ক্বচিৎ-কদাচিৎ যদি কখনো শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন-মহাকাব্য অভিনীত হয়ে থাকে, তার সঙ্গে পেশাদার রঙ্গমঞ্চে শঙ্করদাস এবং নলিনী দাসীর যুগলাবতরণে যে রকম হৈ-চৈ আরম্ভ হয়েছিল, এবারের মহাপ্রভু-পালায় তার তুলনা করতে যাওয়া চরম অবিমৃষ্যকারিতা ছাড়া কিছু নয়। শঙ্করদাসের অভিনয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছিলেন সেদিন শ্রীগৌরাঙ্গ; মনে হয়েছিল দ্বিতীয়বার জন্ম নিয়েছেন বুঝি নবদ্বীপের দ্বিজোত্তম অবতারকল্প ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। আর তারই সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে চলেছিল যার বুকের রক্ত নিঙড়ানো অভিনয় শচীমাতার স্মরণীয় চরিত্রে তারই অবিস্মরণীয় নাম: নলিনী দাসী। প্রথম অভিনয়ের রাতে একবার অকস্মিক ভাবে নয়; যেখানে যতবার নেমেছে সেই দু'জন,—শঙ্কর-নলিনী ততবার ধন্য-ধন্য করেছে সাধারণ থেকে অসাধারণ সমস্ত কণ্ঠ একযোগে।

যে সময়ের কথা বলছি, সেই সময়ে পেশাদার রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়ে শঙ্কর-নলিনী দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের নিজস্ব সম্প্রদায় নিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ মাহাত্ম্য কীর্তন করে। অর্জুন সিং-এর ট্যাক্সীতে প্রথম যেদিন পদধূলি পড়ে তারকা-যুগলের, তখন

পেশাদার রঙ্গমঞ্চে তাদের অভিনয়ের শেষ কয়েক রজনী চলছে। শঙ্কর-নলিনী তখন অল্‌রেডি লিজেণ্ড কলকাতায়। তাদের সম্পর্কে কত গল্প, কাব্য, কাহিনী লোকের মুখে-মুখে পল্লবিত হয়ে প্রবাদে দাঁড়িয়ে গেছে। শঙ্করদাস নাকি হবিষ্যি করে; নলিনীও। অভিনয়ের সময়ে কোনও স্ত্রীলোকের মুখ দেখে না শঙ্করদাস; এমন কি তেতলায় তার নিজের ঘর থেকে মঞ্চে প্রবেশ করা তক কোনও রমণীর আনন যদি দৈবাৎ আত্মপ্রকাশ করে অনবধান-বশতঃ, তাহলেও ষ্টেজের ওপর 'ড্রপ' ফেলতে বাধ্য হয় ষ্টেজের একমাত্র সত্ত্বাধিকারী মহামায়ার ভক্তসেবক শ্রীহরনাথ ভট্টশালী; কারণ মেয়েছেলের মুখ দেখা মাত্তর মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যাবে শঙ্করদাস; আবার গঙ্গোদকে শুদ্ধ হয়ে মঞ্চমুখী হতে পুরো দশ মিনিটের টেবল-চেয়াব ভাঙ্গবাব উপক্রম-প্রায়-বিবতি।

এই প্রবাদের অনেকটাই চিড় খেয়ে গেল অর্জুন সিংএর কাছে —তার ট্যাক্সীতে যেদিন প্রথম জোড়ে অবতীর্ণ হল শঙ্করদাস মুখো এবং নলিনী দাসী। শঙ্কর বলছিলো; আর হেসে গড়িয়ে পড়ছিলো নলিনী। শঙ্কর বলছিলোঃ জানো, আজ ভট্টশালীকে দারুণ টাইট দিয়েছি? নলিনী চোখ বড় বড় করে শুনেঃ এই সেদিনকার কেলেঙ্কারীর পর আবার আজ? শঙ্কর জবাব করলোঃ হ্যাঁ, বড্ড তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? হোক, শালা যেমন বুনো ওল,— আমিও তেমনি বাঘা তেঁতুল।

আসল ব্যাপারটা হচ্ছে শ্রীগৌরাঙ্গ পালা যখন খোলে, হরনাথ ভট্টশালী তখন শঙ্করের চেয়ে অনেক নাম-করা একজন অভিনেতার শ্রীগৌরাঙ্গর ভূমিকায় নামবার কথা; রিহার্সালও সে-ই দিচ্ছিলো; মহলার সময়ে উইংসের পাশে এসে চুপ করে দাঁড়িয়েছিলো শঙ্কর। কেউ তাকে লক্ষ্য করেনি; লক্ষ্য করবার মতো কিছু হয়ওনি তখন শঙ্কর। চল্লিশ টাকা মাসিকের এক্সট্রা শঙ্কর; কখনও কাটা সৈনিকের রোলে; কখনও ভীড়ের মধ্যে থকে জী হুজুর

অথবা জয় অমুকের জয় বলে চীৎকার করে ওঠবার জন্যে মঞ্চে প্রবেশ করে। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গর ভূমিকায় যে ব্যর্থ মহলা দিচ্ছিলো, তার দিক থেকে বিরক্তিতে মুখ ঘুরোতেই সেদিনকার: মঞ্চের নাট্যসম্রাজ্ঞী, শচীমাতার ভূমিকায় যার অবতরণ শ্রীগৌরাঙ্গ পালার একমাত্র আকর্ষণ, সেই নলিনী দাসীর চোখে পড়লো শঙ্করদাস মুখুজ্যের দাঁড়ানোব সহজ ভঙ্গীটি।

চীৎকার করে উঠলো তীব্রদৃষ্টি নলিনী: ওইতো,—শ্রীগৌরাঙ্গ দাঁড়িয়ে—কোথায়? সমবেত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা, কৌতূহল এবং কোলাহল উঠলো; সকলের দৃষ্টি একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়লো শঙ্করদাসের ওপব,—সবাই হেসে উঠল একগলায়: আপনার কি ভিমরতি হয়েছে। ওতো আমাদের শঙ্কর। শঙ্করদাস মুখুজ্যে, চল্লিশ টাকার এক্সট্রা ততক্ষণে আর সহজ নেই, আড়ষ্ট হয়ে গেছে দারুণ; এবং নিদারুণ লজ্জায় এক-পা দু-পা কবে পিছু হটতে সুরু করেছে এক্সট্রাদের খোঁয়াড়ের দিকে। নলিনী দাসীও কথা বলেনি আর একটিও। শুধু জমেনি সেদিনকার মহলা, শ্রীগৌরাঙ্গ ভূমিকায় যার নামার কথা তার কোনও দিনই জমছিলো না,—সেদিন বরং একটু আশাপ্রদ বলে মনে হলো তাকে; কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ পালার একমাত্র আকর্ষণ নলিনী নিষ্প্রভ হলো যেমনভাবে কুঁকড়ে যায় নিওন সাইনের নীল আলো দিবালোকেব নির্লজ্জ রূঢ়তায়। তার ছিঁড়ে গেছে বেহালাব বলে দিতে হলো না কাউকেই।

হরনাথ ভট্টশালী শঙ্করদাসকে লক্ষ্য না করলেও নলিনীর কথা তাব কাণের দৃষ্টি এড়ায়নি; মহলার শেষে নলিনীকে ডেকে পাঠালো হরনাথ। নলিনী সত্যিই শঙ্করকে দিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গ হতে পারে বিশ্বাস করে কি না জানতে চাইল হরনাথ। নলিনী যে শুধু বিশ্বাস করে তাই নয়,—শঙ্কর ছাড়া আর কাউকে দিয়ে যে নামকরা অভিনেতা শ্রীগৌরাঙ্গর ভূমিকা মঞ্চস্থ করা সম্ভব বলে সে বিশ্বাস করে না। যদি সম্ভব মনে করে হরনাথ ভট্টশালী তাহলে নলিনীকে

শচীমাতার ভূমিকায় নামানো অসম্ভব এ নাটকে, একথা যেন মনে রাখে মঞ্চের একমাত্র সত্ত্বাধিকারী। হরনাথ তাকে ডেকেছিল পরামর্শ করবার জন্যে; নলিনী দাসী যা দিয়ে গেল তা হরনাথ ভট্টশালীর মাতৃভাষা ইংরেজি হলে হরনাথ তার নাম দিত আলটিমেটাম বলে।

হৈ হৈ পড়ে গেল শ্রীনিকেতন মঞ্চে। ছড়া বেঁধে সুর দিয়ে গাইতে লাগল মঞ্চের সুবিখ্যাত ভাঁড় নাড়ুগোপাল দত্ত:

বল মা তারা কোথা দাঁড়াই ?
ছাগল দিয়ে হলে যব মাড়াই
তরমুজ এক হাত হতো:
আর তার বিচি হতো হাত আড়াই
বল মা তারা কোথা দাঁড়াই।

সেই মুহূর্তে হরনাথ ভট্টশালী শ্রীনিকেতন মঞ্চের সকলকে মাইনে বোনাস ঘোষণা করলে যতখানি না অবাক হতো হরনাথের তাঁবে যারা আছে তারা; অথবা শত্রুপক্ষের অর্থাৎ পাশের জুপিটার থিয়েটারের পয়লা নম্বর ঘোড়া রঙীন চৌধুরী, যদি শুনতো তারা যে রঙীন চৌধুরী জুপিটার ছেড়ে জয়েন করছে তাদের শ্রীনিকেতনে অনেক কম বেতনে তাহলে সেই অসম্ভব, অবিশ্বাস্য, অলীক না হলেও প্রায় অলৌকিক সেই সংবাদে তারা হাসবে কি কাঁদবে ভেবে না পেয়ে যা হতে তার চেয়ে অনেক বেশী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলো যখন শেষ পর্যন্ত পোষ্টার পড়লো রাস্তায় রাস্তায় শঙ্করদাসের এবং নলিনী দাসীর নামে উজ্জ্বল শ্রীগৌরাঙ্গ পালা,—শ্রীনিকেতনের আগামী আকর্ষণ। ঘোষণার মধ্যে যে দু'টি ব্যতিক্রম কারুর দৃষ্টি এড়াতে পারলো না তার একটি হচ্ছে শঙ্করদাসের নাম আগে এবং নলিনীর নাম পরে; দ্বিতীয় দ্রষ্টব্যের বিষয় হলো যা তা হচ্ছে নলিনী আর দাসী নেই; পোষ্টারে কখন উত্তীর্ণ হয়েছে দেবীত্বে; অর্থাৎ নলিনী দাসী হয়েছে নলিনী দেবী।

সেন্স অফ হিউমার হারায় নি দেখা গেল কেবল শ্রীনিকেতন মঞ্চের একমাত্র সত্বাধিকারী হরনাথ ভট্টশালী ; সে এর ব্যাখ্যা করল এই বলে যে শঙ্করদাস মুখো যে ব্রাহ্মণ;—কাজেই নলিনী আর দাসী থাকে কি করে ; তাকে অগত্যাই দেবী হতে হয় যে। এই পর্যন্ত বলেই থামে ভট্টশালী ; বাকীটুকু বলে একচোখ বন্ধ করে আর ঠোঁটের কোনে মিষ্টি হাসির ছুরিতে। মুখে খুলে বলতে চাইলে কি বলতে চাইছে সে এর চেয়েও স্পষ্ট করে বলা শক্ত ছিলো আর হরনাথের রীতি-নীতির সঙ্গে যারা ঘনিষ্ট তাদের কাছে।

সব চেয়ে হতবাক হয়েছে যে সে স্বয়ং শঙ্করদাস। মাত্র কয়েক দিন আগে, শ্রীনিকেতন মঞ্চের বিগত নাটকের এক দৃশ্যে নলিনীকে ধরে নিয়ে আসার একমাত্র দৃশ্যে দেখা দিতো চল্লিশ টাকার সুপার শঙ্কর দাস ; ধরে নিয়ে আসার বদলে চুলের মুঠি ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে এসেছিল শঙ্করদাস একদিন। অডিটরিয়মের রি-এ্যাকশন হয়ে ছিলো এ ওয়ান। অন্যান্য সুপারেরা সন্দেশ খাইয়েছিলো দু'টাকার। সকলেরই রাগ থাকে নাট্যসম্রাট এবং সম্রাজ্ঞীদের ওপর,—সুপাররা হচ্ছে সত্বাধিকারীর পর, যাদের বেলা সর্বদাই দাঁত-কপাটি আর নলিনী দাসীরা সত্বাধিকারীর নিজের,—যার বেলা আঁটিশুটি। কিন্তু হরনাথ ভট্টশালীর থিয়েটায় প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড় হয়েছিলো ; কৈফিয়ৎ তলব করা হলে তার ব্যক্তব্য ছিল যে, যেহেতু সে রাক্ষসানুচরের ভূমিকায় নেমেছে সেহেতু তার আচরণ রাক্ষসানুযায়ী যথেষ্ট অশালীন হওয়া দরকার; তাছাড়া নাট্যসম্রাজ্ঞী নলিনী দাসীর মুখেই সে শুনেছে অভিনয়ে ভদ্রতার চেয়ে বড় হচ্ছে বাস্তবতা ; ভূমিকাকে সত্য করে তোলাই শিল্পীর সবচেয়ে বড় স্বধর্ম।

শঙ্করদাসের কাছ থেকে এরকম কৈফিয়ৎ আশা করেনি হরনাথ ভট্টশালী ; নলিনী দাসীর ওপরেও হরনাথ যে খুব খুশি ছিল এমন

নয় ; মনে মনে সে খুশি হলো, ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি আর এক চোখ বুজিয়ে ফেলার মুদ্রাদোষ ঠেকাতে পারলো না এবারেও। নলিনী দাসীরও কি হলো কে জানে ; সেও দুরন্ত রাগ আপাতবিস্মৃত হয়ে ফিক করে একটু হেসে দিলো। নলিনী যদি চন্দ্রশেখরে শৈবলিনী হতো, শঙ্করদাস হতো প্রতাপ, তাহলে বলা যেত সেই হাসিই নলিনীর কাল হলো ; নলিনী ডুবলো। কিন্তু তার সেই শঙ্করে ডুবে যাওয়ার বিশদতম বিবরণের জন্যে পাঠিকাদের ধৈর্য ধরতে হবে আরেকটু। তার আগে অন্য কথা আছে ; সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগে যেমন আছে সাধভক্ষণ।

নলিনীর ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হলো না। শ্রীনিকেতন মঞ্চের ঊর্দ্ধতন থেকে নীচের মহল পর্যন্ত সকলের সন্দেহ, বিদ্রূপ, ব্যঙ্গ, আস্ফালন বক্রোক্তি, সুনিশ্চিত সংশয়, ব্যর্থতা সম্পর্কে নির্দ্বিধা, সমূহ লোকসানের ভয়াবহ আশঙ্কা, যেমন কর্ম তেমন ফলের বড় আশার বাড়া ভাতে ছাই দেবার প্রথম রজনীতেই শঙ্করদাসের শ্রীগৌরাঙ্গ ডঙ্কা বাজিয়ে বাজি মেরে দিয়ে গেল উচ্ছ্বসিত করতালিতে, বাঁধ না-ভাঙা ভক্তি-অশ্রুর যুক্তধারায়, আনন্দবিহ্বল নরনারীর বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টির অভিনন্দনাঞ্জলিতে। এমন কি নলিনী দাসীকেও ঈষৎ নিষ্প্রভ মনে হলো শচীমাতার ভূমিকায়, একশো মোমবাতি শক্তির বালবের পাশে ফ্লুরেশেণ্ট টিউবের মতো।

দেখতে দেখতে দাবানলের চেয়েও দ্রুত শঙ্কর-নলিনী যুগল জয়যাত্রার, যথাক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শচীমাতার রোলে, স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে গেল, কলকাতা, শহরতলীর, এবং সুদূর মফঃস্বলের বিপুল জনারণ্যে। পাগল হয়ে গেল সেই উনিশশো চৌত্রিশ সালে ভারতের প্রথম শহর জব চার্নকের প্রেয়সী কলকাতা। বৃদ্ধা, প্রৌঢ়, যুবক এবং শিশু উল্টো করে বলা চলে আট থেকে আটাশ বছরের আবাল-বৃদ্ধবনিতা রাতের পর রাত মঞ্চের ওপর শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা প্রত্যক্ষ করতে দলে দলে গোছা গোছা নোটের হরির লুট দিতে

কার্পণ্য করলে না বক্স অফিসের একফালি কাউন্টারে। কোন কোনও অসাধারণ ভক্ত অভিনয়ের আরম্ভ, মাঝখানে শেষে মঞ্চের অপর উঠে এসে আলিঙ্গনে, চুম্বনে, আশীর্বাদে এবং প্রণামে পরিবর্তিত করলেন সম্পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের বাতাবরণ; ভক্তি, প্রেম এবং অশ্রুচন্দনে চর্চিত শ্রীনিকেতনের মামুলী পানের দাগ লাগা দেওয়াল থেকে শুরু করে বিড়ি সিগারেটের গন্ধের বদলে এল ফুল তুলসী, নামাবলী এবং হরিনাম কীর্তন। মঞ্চকে মনে হতে লাগল মন্দির; কুশী-লবদের ভক্তবৃন্দ; শঙ্কর-নলিনীকে মনে হলো স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ-শচীমাতার সেই আশীর্বাদ ধন্য যে আশীর্বাদে পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে এবং বোবা হয় বাঙ্মুখর; বাচাল।

প্রথম রজনীতে বৈষ্ণব ভক্তসম্প্রদায়ের মনে শ্রীগৌরাঙ্গর মঞ্চরূপ আশানুরূপ না হতে পারার কারণে ব্যথা লাগার আশঙ্কায়; নাটকের পান থেকে কলার চুণ খসলেই যাদের সতীত্ব নাশ হয় সেই সব সমালোচকদের যাদের দৃষ্টিভঙ্গির তুলাদণ্ডে রসের চেয়ে ব্যাকরণ, আত্মার চেয়ে দেহ, সুঠাম অঙ্গের চেয়ে গুরুভার অলঙ্কারের সৌন্দর্য ওজনে অনেক ভারী, অতৃপ্তিবিধানের সম্ভাবনায়; সর্বোপরি সাধারণ দর্শক, যারা বয়স হলেও হয় নাবালক নয় স্ত্রীলোক; তাদের কাছে যথেষ্ট গদগদে রকমে অতি নাটকীয় না হতে পারার জন্যে বিচারে রসোত্তীর্ণ নয় বলে বিবেচিত হবার বিভীষিকায় শ্রীনিকেতনের মাটি থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটি আসনের প্রত্যেকটি ছারপোকা পর্যন্ত অশুদ্ধ বাঙালায় ছিলো, যাকে বলে সশঙ্কিত চিত্ত, তা-ই। কিন্তু সকলের সমবেত আশঙ্কার ঐকতানের কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে উচ্চারিত হলো আশাতীত সাফল্যের নিম্নকণ্ঠ, কিন্তু সুনিশ্চিত জয়ধ্বনি। হরনাথ ভট্টশালী তাঁর পক্ককেশ অভিজ্ঞতার অতিবৃদ্ধ ইতিহাসের পাতার পর পাতা উল্টে অনুরূপ পূর্বসাফল্যের কোনও উল্লেখ পেলেন না এমন যা শ্রীনিকেতন মঞ্চর এই অভূতপূর্ব ঘটনা। শ্রীগৌরাঙ্গ পালায় দিগ্বিজয়-কাণ্ডের কোটি মাইলের মধ্যে গিয়ে

দাঁড়াতে পারে। অভূতপূর্ব, এই কথার অর্থ আক্ষরিক সত্য হয়ে দেখা দিল জীবনে কোনও ক্ষেত্রে এই প্রথম। ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে গেল শ্রীহরনাথ ভট্টশালী; শ্রীনিকেতনের আঙুল ফুলে হলো কদলী বৃক্ষ। মাটি ফুঁড়ে; আকাশের আড়াল থেকে; পাতালের অন্ধকার থেকে জনসমুদ্রের জোয়ার এসে মধ্যবিত্ত বক্স অফিসে গ্রীষ্মশীর্ণ নদীর দু'কূল ভাসিয়ে নিয়ে তেমন বিক্রী না হওয়ার চড়াকে ধ্বসিয়ে তলিয়ে নিয়ে চলে গেল প্রবল উদ্বেল কিউএর আণ্ডার-কারেণ্ট অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে কখন।

শ্রীনিকেতনের গতর-বার-করা বাড়ীতে রাজমিস্ত্রীর হাত পড়লো হরনাথ ভট্টশালীব আমলে এই প্রথম। আসনেরও হলো অদল বদল। এ পর্যন্ত যা আয় হয়েছে তাব ওপব নির্ভর করে হরনাথ রঙচঙেব মতো অসার চাক্যচিক্যে এতখানি ব্যয় কববার পাত্র নয়, শ্রীনিকেতন মঞ্চে চিরকালের মতো টিকিটের দাম, আসনের সংখ্যা বৃদ্ধির এমন মওকা আসতে আবার আরেক যুগ; অতএব মেক হে হোয়াইল দি ষ্টাবস টুইঙ্কল। সেই অনতিদূর ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে তিনশো রাত্তিব ধরে একটানা শ্রীগৌরাঙ্গ চলবার পর এবং আরও সাড়ে ছশো বার চলবার আগে বিন্দুমাত্র মন্থর হবার সম্ভাবনা নেই, এ সম্বন্ধে স্থিরসিদ্ধান্ত হবার পর তবেই শ্রীনিকেতনের জীর্ণবাস পরিত্যাগ করে এই নবজন্ম পরিগ্রহ-পর্বের সূচনা। আজকের সময় হলে হরনাথ ভট্টশালী অনায়াসে বিজ্ঞাপনের ঢাক বাজাতে পারতো যে ভাষায় তা হচ্ছে অর্ধকোটি টাকা ব্যয়ে সুসংস্কৃত মহাজাতীয় রঙ্গশালা। কিন্তু হরনাথ ভট্টশালীর শ্রীনিকেতনে যখন শ্রীগৌরাঙ্গ চলছে, তখন কেবল বিজ্ঞাপনে কিংবা শুধু নাট্যগৃহের সংস্কারসাধন করেই অথবা নতুন বোতলে মান্ধাতার আমলের মদ ঢেলে নাট্যান্দোলন বলে চীৎকার করলেই কলকে পাওয়া যেত না। তখন সিনেমার কাগজে থিয়েটারের সমালোচনা দুয়োরাণীর অবস্থা প্রাপ্ত হয়নি।

তখন পঞ্চাশ রাত একটানা অভিনয় হলে কোনও পালার, পূর্তবিভাগের ডেপুটি মিনিষ্টার আসতেন না নাটকের ওপর বক্তৃতা দিতে। প্রেক্ষাগৃহে পানের দাগ; বিড়ির গন্ধ ছিলো ঠিকই,—কিন্তু মঞ্চের ওপর নাট্যজগতের সূর্য চন্দ্র থেকে সুরু করে জোনাকি লণ্ঠন, মোমবাতি, দেশলায়ের আলোর চেয়েও অল্প জোর যাদের, তাদের নাট্য-বিষয়ক বক্তৃতাবলী বিরক্তির উৎপাদন করত না এত ঘনঘন। সেদিন সরকার অথবা নাটক একাদেমীর প্রয়োজন হয়নি নাটক চালনার জন্যে। বাঙলা দেশে তখন ভালো নাটক নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারতো। তার পরিবর্তে আজ কি দেখছি? আজ দেখছি, শতাধিক বছর আগে মাইকেল যে কারণে নাট্যকারের কলম হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন মহাকাব্যের লেখনীকে সাময়িক ছুটি দিয়ে অর্থাৎ ইংরেজি অথবা সংস্কৃত থেকে অনুবাদ না করে মৌলিক বাঙলা নাটকের জন্ম দেবার অভিপ্রায়ে আজ ঠিক তার উল্টো ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে বিশ্বাস না করে উপায় কি যে ডি, এল, রায়ের আলেকজাণ্ডার সত্যই বলেছিলেনঃ সত্য সেলুকস কি বিচিত্র এই দেশ। বিচিত্রই বটে; মান্ধাতার চেয়েও পুরাণো নাটকের স্কিম নিয়ে এদেশে তাকে নাট্যান্দোলনের অগ্রদূত বলে চালানো এদেশ বিচিত্র না হলে সম্ভব হতো কিসে? নাটক ছাড়া আর যা কিছু নিয়ে আন্দোলনই এখন নাট্যান্দোলন বলে পাওা পায়। নাটক দেখে এসে লোকে তো বটেই স্ত্রীলোকেরাও এখন নাটকের কথা বলে না, উচ্চবাচ্য করে না অভিনয় ব্যাপারে, শুধু বলে ষ্টেজের ওপর উড়োজাহাজ নামতে দেখলাম কেমন। প্লে নয়, ম্যাজিক। আলোর খেলা; আলোক-সম্পাত নয়, এর নাম হওয়া উচিত আলোক-অভিশম্পাত।

শঙ্কর-নলিনীর অভিনয়ই নয় শুধু তারা ক্রমশঃ কিংবদন্তীর চরিত্র হয়ে দাঁড়ালো। ক্রমশঃ ছোটখাটো রটনার ডালপালা বাড়তে বাড়তে প্রায় প্রবাদে দাঁড়িয়ে যাবার উপক্রম হলো। শঙ্কর

এবং নলিনী দু'জনেই নিরামিষ খায়, শঙ্কর স্বপাক হবিষ্যান্ন। স্ত্রীলোকের মুখ দেখে না অভিনয়ের রজনীতে। যে শুনলো একথা সেই বলল একবাক্যে ; এমন না হলে এমন অভিনয় সম্ভব কখনও ? অভিনয় তো নয়, প্রেমের অবতার যেন জীবনমঞ্চে পুনরাবির্ভূত। এছাড়া যা আরও ভয়ঙ্কর কানে এলো তা আমরা যারা শঙ্কর দাসকে ছাত্রাবস্থা থেকে জানি তারাও তাজ্জব হয়ে গেলাম ; যে শঙ্করের গলার ছায়া মাড়াতো না এক কণা সুরও, সেই শঙ্করদাস এখন মঞ্চের ওপর কেবল অনবরত গান গায় যে তাই নয়, সেই গানের জোয়ারে আবেগের বন্যায় কলকাতা ডুবডুবু ; মফঃস্বল ভেসে যাওয়ার অবস্থা। যে শঙ্কর মাছ-মাংস খেতে পেলে মানুষের পেটে কতখানি ধরে কোনও দিন জানতে চাইতো না, সেই শঙ্কর আমিষ খাদ্যের গন্ধে বমি করে ফেলে ; যে শঙ্কর বাচ্চা বাচ্চা মেয়ে দেখলেও হুমড়া খেয়ে পড়তে লজ্জা পায়নি কোনও দিন, সেই শঙ্কর এখন অভিনয় রাত্রে অন্য মানুষ ; নিজের ঘর থেকে মঞ্চের ওপর পর্যন্ত যাবার পথের মধ্যে কোন শাড়ী যদি দৈবাৎ এসে দাঁড়াত তাহলেও শঙ্কর তৎক্ষণাৎ মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করত নিজের কামরায় ; 'ড্রপ' দিতে হতো অনেকক্ষণের জন্যে : ভয় কাকুতি, অনুরোধ উপরোধেও এর ব্যতিক্রম হবার জো ছিলো অল্পই।

কিন্তু পুরোটাই শঙ্করদাস অভিনয় পারঙ্গম হবার কারণে কবভো এমন মনে করলে শঙ্করদাসের প্রতি অন্যায় করা হবে ; শঙ্কব যখন শ্রীগৌবাঙ্গর ভূমিকায় বাঙলা দেশের জগৎজোড়া খ্যাতির অধীশ্বর, তখনও কিন্তু তার মাইনে মাসে শতঙ্কার নীচেই, ওপরে নয়। নয় তার অন্যতম কারণ হরনাথ ভট্টশালীরও যেমন তখন শঙ্কর দাস ছাড়া শ্রীনিকেতন অচল, তেমনই শ্রীনিকেতন ছাড়া আরও কোনও মঞ্চে অবতীর্ণ হওয়া শঙ্কর দাসের পক্ষেও সম্ভব ছিলো না ; শঙ্করকে শ্রীগৌরাঙ্গর ভূমিকায় মহলা দেবার আগে দু বচ্ছরের জন্যে শ্রীনিকেতনে বাঁধা থাকবার অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করাতে ভোলেন

নি হরনাথ ভট্টশালী; নলিনীর কথায় এবং এই আশঙ্কায় যে যদি সত্যি সত্যি জমে যায় শ্রীগৌরাঙ্গ পালা তাহলে শঙ্কর দাস এতদিন-কার সমস্ত অপমান, তাচ্ছিল্য, অল্প বেতনের ঋণ সুদসুদ্ধ তুলে নেবে শ্রীনিকেতন মঞ্চের এক মাত্র সত্বাধিকারী হরনাথ ভট্টশালীর একার ওপর দিয়ে; অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর মুহূর্তে শঙ্করের বেতন চল্লিশ থেকে পঁচাত্তর টাকা মাসে প্লাস ট্যাক্সী ভাড়া বাড়ী টু থিয়েটার গ্রাণ্ট করতে হয়েছিল অবশ্য ভট্টশালীকে; তবে শ্রীগৌরাঙ্গ পালা একশো রাত চলবার পর তবেই এই চুক্তি চালু হবে একথারও অবধারিত নির্ভুল উল্লেখে ক্রটি করেনি ভট্টশালীর এটর্নী ভট্টশালী কর্তৃক ইন্সট্রাক্টেড হয়েই অবশ্য; তার আগে নয়।

ঠিক এই সময়ে যখন শ্রীগৌরাঙ্গ পালা সাঙ্ঘাতিক জমে উঠেছে শ্রীনিকেতনের সকলের গায়ে এবং স্বয়ং শ্রীনিকেতন মঞ্চের গায়ে যখন যথেষ্ট মাংস লাগছে এবং সেই সময়ে যখন শঙ্কর দাস আঙুল কামড়াচ্ছে অমন চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্যে, সেই সময়েই অর্জুন সিংএর ট্যাক্সীতে শঙ্কর-নলিনীর আবির্ভাব ঘটেছে যুগলে। অর্জুন সিং তাদের মুহূর্তের মধ্যেই চিনেছে; সেদিন এমন অবাঙালী অল্পই ছিলো শ্রীনিকেতনে শ্রীগৌরাঙ্গ পালায় এদের দু'জনকে একাধিকবার যে না প্রত্যক্ষ করেছে। এবং আরও একাধিকবার এদের দর্শন পাবার ব্যাকুল বাসনার পূর্তি না হওয়া পর্যন্ত যার মনে না বাসা বেঁধেছে দুরন্ত ক্ষোভ! অর্জুন সিংএর ত কথাই নেই; সে বাঙলা বলে এবং বোঝে এভারেজ বাঙালীর চেয়ে কিঞ্চিৎ ভালোই। আজকের দিন হলে হয়ত তার অভিজ্ঞতা আমাকে লিপিবদ্ধ করতে হতো না; সে নিজেই তা স্বচ্ছন্দে করে নাম দিতে পারতো; যখন ট্যাক্সীর ড্রাইভার ছিলাম, অথবা ট্যাক্সীর কবাট। অর্থাৎ সেদিন যেমন বেবি ট্যাক্সী বেরোয়নি তেমনই যারা লিখতো তারা আসলে লেখকই ছিলো বেবি লেখক ছিলো না। এখন লেখকের বদলে যারা কলম হাতে তুলে নিয়েছে লেখা তাদের কাছে সখের খেলা;

এই সব সৌখীন লেখকদের অশুভ দৃষ্টিপাতেই বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের কলেবর দিনে দিনে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে।

অর্জুন সিং কিন্তু প্রথম দিনেই নিদারুণ চোট খেল তাব স্বতস্ফূর্ত ভক্তির কলজেয়। স্বর্গ থেকে পতন হলো তাব দেবতার। শঙ্কর দাস বিগলিতচিত্তে নলিনীর গায়েব ওপর গডিয়ে পডে বলছিলো বত্রিশ-পাটি দাঁত আকর্ণ বিকাশ কবে: শুনেছ কাল কি বকম টাইট দিয়েছি হরনাথ শালাকে? কি বকম? কি বকম শুনি?- -ফূর্তিব প্রাণ গ:ডেব মাঠ, পানেব রঙে লাল বসালো ঠোঁট কোনও কোনও বিধবা যেমন উঠতি ছোকরার সান্নিধ্যে মাছের গন্ধে উৎফুল্ল মুখ দিয়ে টপ্ টপ্ ক:ব লাল গডিয়ে-পডা বেডালের মতো অস্থিব হযে পড়ে তেমনই মুখে পান পুবে দিযে গোটা কয়েক, নলিনী দাসী প্রায় কোলেব ওপব উঠে পডে আব কি ট্যাক্সীব চালক অর্জুন সিংকে তোয়াক্কা না করে, কিংবা ড্রাইভাবের মাথাব সামনে ফিক্স কবা আয়নাকে আমলের মধ্যে না এনে। শঙ্কব দাসও কিছু কম যায় না তার চেয়ে, বয়সে এক বিঘৎ বড়ো সেই নচ্ছাব মেযেমানুযেব থেকে; হাতটাকে পেছন দিয়ে নলিনীর ডান কাঁধের ওপব দিকে ঝুলিয়ে দেয় নির্লজ্জের মতো; বলে: শালা মাইনে বাডাবে না, বললে অজুহাত তোলে দেড়হাত চওড়া; আসলে রক্ষেকবচ হচ্ছে আমাব সই করা সেই কগজখানা বুঝেছ নলি? আজ বুঝিান; যেদিন তুমি সই করে দিলে ফস করে কাগজখানায,—শ্রীগৌরাঙ্গব রোল যদি ফসকে যায় হাতেব মুঠোর মধো এনে এই ভয়ে,—সেদিনই বুঝেছি! তোমায় বলেও ছিলাম; তুমি আমাকে সেদিন বিশ্বাস কবোনি অথচ আমার একার কথাতেই তুমি বোলটা পেতে যাচ্ছিলে এবং শেষ পর্যন্ত পেলেও; কিন্তু পেলে হবে কি, তখন তো নিজের হাতে ফাঁসির হুকুম দিযে বসে আছ আগাম—! কি করে বিশ্বাস করি বলো? অত বড় পার্ট ছেড়ে, একটাব বেশী দুটো ডায়ালগ বলবার সুযোগ পাইনি কখনও; তাছাড়া—

তাছাড়া বলেই কেন কে জানে থেমে গেলো শঙ্করদাস। অর্জুন সিং তাকিয়ে দেখলো আয়নায়; শঙ্করের হাত এখন নলিনীর যেখানে সেখানে পাবলিকলি হাত রাখলে পুলিশের হাতে পড়ার কথা প্রকাশ্যে অশালীন ব্যবহাবেব অভিযোগে; কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্রই অকুস্থল থেকে আরক্ষবাহিনী সাধারণত সেই পরিমাণ দূরে থাকার চেষ্টা করে সম্ভবত যত দূরে অন্তর্যামী থেকে নয়, প্রণামী আদায় করাই যার একমাত্র পূজার প্রণালী সেই পাণ্ডামহাপ্রভুরা। শঙ্কর থামলেও নলিনী ছাড়লো না; ফোঁস করে উঠলো আহতা ফণীর মতো: তাছাড়া কি? এক ঝটকায় সরিয়ে দিলো শঙ্করের কর; সরে গেলো ইঞ্চি কয়েক। অর্জুন সিং প্রস্তুত হলো। ঝড় উঠেছে; বজ্র এবং ধারাবর্ষণ দুই-ই আসন্ন।

তা ছাড়া,—তখন তুমি, আমার ছিলে না; তোমার মনের মানুষ ছিলো তখন মদন চৌধুরী। কি করে আমি সন্দেহ না করে থাকতে পারি যে, আমাকে গাছে তুলে দিচ্ছ শেষ পর্যন্ত মই কেড়ে নিয়ে সকলের কাছে হাস্যাস্পদ করবে না বলে; এছাড়া আমার ক্ষেত্রে তুমি হলে অন্য কিছু ভাবতে পারতে, বলো?

তুমিও কিছু কম যেতে না সেদিন, ঝাঁঝিয়ে ওঠে নলিনী: চল্লিশ টাকার একস্ট্রা হলে কি হয়, তোমাব নজর ছিলো পুষ্প বলে সবচেয়ে ত্যাঁদোড় আর সব চেয়ে কম বয়েসী ছুঁড়িটার ওপর; আমি নিজে থেকে না এসে পড়লে এতদিনে দিতো তো ঐ খাঁড়ার মতো নাকখানাকে উকো দিয়ে ঘষে সমান করে; দিতো কি না বলো?

আমার অন্যায়ের মাপ আছে; পুষ্প ছাড়া কে ছিলো সেদিন, যার আশায় শ্রীনিকেতনে রাতের পর রাত মান অপমান গ্রাহ্য না করে পড়ে থাকতে পারি? তোমার কি দায় ছিলো মদন চৌধুরীকে আদর দেবার।

কি দায় ছিলো? আমার মনের মানুষ যে তখন পুষ্পর জন্য

হাত পা ছড়লেও কাঁটায়, আমাকে দেখলেই দূরে সরে যায়; শুদ্দুর দেখলেই যেমন দূর দূর করে ওঠে বামুন তেমনি—

দূর দূর কথাটা ঠিকই বলেছ; তবে বামুনের মতো নয়। সিঁদুরে মেঘ দেখলেই যেমন ডরিয়ে ওঠে ঘর-পোড়া গরু তেমনই দুরু দুরু করত আমার বুক তোমাকে দূর থেকে দেখেই—

কেন আমি কি বাঘ না ভালুক?

ভালুক—

আমি ভালুক?

হ্যা; জানো না, ভালুক জানে বাসতে ভালো? তোমার চেয়ে ভালো করে ভালোবাসতে আর কে জানে বলো? ব্যস! শরৎকালের লঘু পক্ষ মেঘের মতো উড়ে গেলো মুহূর্তে; বর্ষণ পর্যন্ত গড়ালো না। আর অর্জুন আয়নায় তাকিয়ে দেখলো, ঘড়ির দুটো কাঁটা যতদূব ব্যবধান বজায় বেখে চলবার পর বারোটার ঘরে এসে আবার যেমন এক হয়ে যায় অনিবার্য ভাবেই, তেমনই বিবদমান দুই বিহঙ্গ আবাব যতদুর সম্ভব ডানা গুটিয়ে গুটি গুটি হয়ে বসলো শীতের সকালে সুখের একজোড়া পায়রার মতোই। এবং তার পরমুহূর্তেই নতুন করে যোজনা কবে ছেঁড়া তার।

যে কথা বলতে যাচ্ছিলাম, শোন নলিনী,—কাল ট্যাক্সী করে যখন শ্রীনিকেতনে পৌছলাম তখন প্লে আরম্ভ হতে আর মিনিট পনের বাকী; ট্যাক্সিতে সারাদিন ঘুরে তিপ্পান্ন টাকার বেশী ভাড়া ওঠাতে পারলাম না; থিয়েটারেব ক্যাশিয়ার তো ভাড়ার বহর শুনে টাকা দেওয়া দূরে থাক কাছা কোঁচা খোলা অবস্থায় ছুটলো হরনাথ ভট্টশালীর উদ্দেশে। আমার ডাক পড়লো সঙ্গে সঙ্গে; হরনাথ বলল: তোমাকে ট্যাক্সী ভাড়া দেব বলে কি তিপ্পান্ন টাকা দেবার দায়িত্ব নিয়েছি বলে তোমার ধারণা? আমি বললাম: বেশ, দেবেন না; আমি পাইকপাড়ায় বাড়ী গিয়ে ভাড়া মিটিয়ে বাসে করে ফের থিয়েটারে আসি তাহলে! বক্স-অফিসের একটা

উঁচু টুলের ওপর থেকে হরনাথের পক্ষে যতটা তাড়াতাড়ি নেমে আসা সম্ভব, তার চেয়েও দ্রুতগতিতে চোখের পলক না ফেলতে নেমে এল তড়াক করে একেবারে আমার সামনে ঃ এখন বাজে ছটা বিশ ; প্রথম ঘণ্টা পড়ে গেছে প্লে আরম্ভের,—তুমি এখন যাবে পাইকপাড়ায়, তারপর বাসে করে আসবে। ইতিমধ্যে তোমার তিপ্পান্ন টাকার খরচা বাঁচাতে গিয়ে নতুন চেয়ারগুলোর একটাও যাতে না বাঁচাতে পারি সেদিকে তোমার এমন সতর্ক লক্ষ্য দেখে ভারি খুশি হলাম। তারপর ক্যাশিয়ারকে ট্যাক্সীর ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে আসতে বলে হরনাথ ভট্টাশালী আমার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে থিয়েটারী ভঙ্গীতে বললো ঃ নাও ; এই পিস্তলটা নিয়ে হয় তুমি আমাকে খুন কর ; না হয় আমাকে দাও ; তোমাকে খুন করে,—অব্যাহতি নিই ! যে কোনও একজন শান্তিতে বাঁচুক শ্রীনিকেতনে। সত্যি সত্যি আমার হাতে পিস্তল গুঁজে দেয় একটা ভট্টশালী !

নলিনী সোহাগে গলে গিয়ে বলল ঃ দিলে না কেন একটা গুলী ঝেড়ে—

সেই মানুষ পেয়েছ হরনাথকে ? পিস্তলটা ফিরিয়ে দিয়ে বললাম ঃ আপনিই মারুন আমাকে ভট্টশালী মশায় ; এ তো থিয়েটারের টয় পিস্তল,—ফাঁকা আওয়াজে আমার বিশ্বাস নেই।

একটু বাদে নলিনী বলল ঃ কাল আর এক কাজ করবো শঙ্কর ; তুমি যখন তেতলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামবে তোমার সীন এলে, সেই সময়েই আমি ওপরে উঠতে যাব ; তুমি তো মেয়েছেলের মুখ দেখো না থিয়েটারসুদ্ধ সবাই জানে ; কাজেই সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে ফিরে যাবে নিজের ঘরে আর ড্রপ দিতে বাধ্য হবে ভট্টশালী ; আবার দশ মিনিটের ধাক্কা,—ততক্ষণে শ্রীনিকেতনের অর্ধেক চেয়ার আস্ত থাকবে না আর ! কি বলো !

বোঝা গেল আদরের আতিশয্যে, শঙ্করের ভারী পছন্দ হয়েছে নলিনীর মতলব।

শঙ্করদাসের সেই সময়েই কন্‌ট্রাক্ট-পিরিয়ড ওভার হবার সময় আগতপ্রায়। হরনাথ ভট্টশালীকে নতুন টার্মস যা দিয়েছে শঙ্কর তা এখনকার দিনে করোনারী থ্রম্বসিসের পক্ষে যথেষ্ট। হরনাথ সেই সময়ে উপায়ান্তর না দেখে রেডি করছিলো মদন চৌধুরী আর পুষ্পকে যথাক্রমে শ্রীগৌরাঙ্গ আর শচীমাতার রোলে নামাবার জন্যে। তাই নিয়েও সাংঘাতিক হাসি-মস্করায় শঙ্কর এবং নলিনীর, হাড়পিত্তি জ্বলে যাচ্ছিলো অর্জুন সিংএর। শঙ্কর বলছিলো নলিনীকেঃ শুনেছ, মদনা নাকি মাছ-মাংস ছেড়ে হবিষ্যান্ন করবে এখন থেকে; আর পুষ্পও মহলা থেকে শুরু করে শ্রীগৌরাঙ্গ পালা খতম না হওয়া তক শুদ্ধাচারে থাকবে বলে শপথ করেছে না কি! হরনাথ ভট্টাশালীও বাইরের লোকেদের মতো ভেবেছে আমি বুঝি মাছ-মাংস ছুঁই না, আর তুমি নিশ্চয়ই সতী-সাবিত্রীর চেয়েও পবিত্র জীবন যাপন করছো—! নলিনী ফস করে টিফিন কেরিয়ারের বাটি খুলে ধরলোঃ ভাগ্যিস মাছ-মাংসের কথা তুললে তুমি তাই; ভুলেই গেছিলাম একেবারে,—মাংসের কচুরি এনেছি—খাও; বোধ হয় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, না?

মাংসের কচুরী ঠাণ্ডা হোক না, আমরা তো ঠাণ্ডা মেরে যাইনি, কি বলো? বিকট হাস্যে ফেটে পড়ে শঙ্কর; আর হাসবার জন্যে মুখ হাঁ করতেই মাংসর কচুরী মুখে পুরে দেয় নলিনী দাসীঃ তাড়াতাড়ি সাবড়াও,—বাড়ী এসে গেছে যে!

আশ্চর্য হয়ে যায় অর্জুন সিং; তার মুখে বাক্য নিঃসরণ হয় না বহুক্ষণ!

কিন্তু চরম আশ্চর্য হবার তখন অর্জুন সিংএর অনেক বাকী। অর্থাৎ কলির তখন সবে সন্ধ্যে। আমরা যারা অভিনয় জগতের অন্দর মহলের লোক, এই আমাদের কাণেও আসছিলো উড়ো খবর

কিছু কিছু। শঙ্করদাস শ্রীগৌরাঙ্গর ভূমিকায় নামবার আগে পর্যন্ত সাধারণ্যে রাম-শ্যাম-যদু-মধুর চেয়ে বেশী কিছু ছিলো না অভিনয় জগতের; আমরা তাকে চিনতাম সহপাঠি হিসেবে, এই মাত্র। কিন্তু নলিনী দাসী, যখন আমবা হাফপ্যাণ্ট পরি তখন থেকেই খ্যাতির অধীশ্বরী এবং ক্রমে ক্রমে নাট্যসম্রাজ্ঞীতে অভিষিক্ত বেশ কয়েক বছর ধরে। শুধু শক্তির আধাব বলে নয়; নলিনীর একটা আলাদা সম্মান ছিলো সর্বত্র; তাব কারণ সে পতিতা হয়েও অধঃপতিতা নয়। একজন মাত্র লোকেব সঙ্গেই এযাবৎকাল সে স্ত্রীর চেয়েও বেশী হয়ে ঘর কবছে; কখনও প্রবঞ্চনা করেনি কোনও প্রলোভনেই। অসুখে সেবা থেকে আবম্ভ করে সেই একজনের জন্যে এমন কিছু নেই যাকে সে একদিনেব জন্যেও অকর্তব্য মনে করে, না করেছে! লোকে অবাক হয়ে নলিনীকে আঙুল দেখিয়ে বলতো পাঁকে যে সত্যিই পদ্মফুল ফোটে জগতে তার আবেক প্রমাণ নলিনী দাসী। শঙ্করদাস আসবার পব দাসী থেকে দেবীতে পা দিলো যেমন নলিনী, তেমনি তার শান্তিব আর লক্ষ্মীশ্রীর আলয়ে আগুণ লাগলো। নলিনীর আশ্রিত দাস-দাসিরা একে একে বিদায় নিলো সবাই; একজন যার সঙ্গে এত দীর্ঘকাল স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করেছে নলিনী, তার অবস্থাও এমন করে তুললো যে সে-ও পালাবার পথ না পেয়ে খিড়কি দিয়ে সরে যেতে বাধ্য হলো; যাবাব আগেই তার ঔরসে নলিনীব সন্তানদের নলিনী নিজের হাতে ইদিক-উদিক পাঠিয়ে দিলো। শঙ্করদাস পাকা-পোক্তভাবে সেই একজনেব গদীতে আসীন হলো কোনও রকম লোকলজ্জা, সংকোচ, দ্বিধা বা সংস্কারের বালাই কণামাত্রও না রেখে। এই সময়েই নতুন করে যা শোনা যেতে লাগলো, তা হচ্ছে নলিনী নাকি বরাবরই এমন ছিলো; অর্থাৎ আগের সেই একজন থাকতেই অনেকজনের সঙ্গেই ডুবে ডুবে জল খেত সে। সমগোত্রীয় আরেক অভিনেত্রীর এতদিন বাদে বোধ হয় নিদ্রা

ভাঙ্গলো ; জেগে উঠেই তিনি নলিনী কেমনভাবে বহুকাল থেকেই লুকিয়ে গাড়ী করে চলে যেত থিয়েটার থেকে ; আবার সেই একজন আসার আগেই ফিরে এসে ঢুকত ইঁদুর যেমন প্রবেশ করে তার নির্দিষ্ট বিবরে, তারই রোমহর্ষক বিবরণ ছিটোতে লাগলো দরাজ হাতে যেমন কেউ মারা গেলে খই আর পয়সা ছড়ায় তার আত্মীয় রাস্তায় রাস্তায় মুঠো মুঠো, ঠিক তেমনি দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে। আমরা সে কথায় অথবা এখন যারা নলিনীর চলন পর্যন্ত বাঁকা দেখতে লাগলো তাদের কুৎসা রটনায় তেমন কান দিইনি। কিন্তু আমাদের সকলের মনেব ফাটল দিয়ে যে জিজ্ঞাসা বাচ্চা-মুরগীর মতো মাথা তুলেছিলো বেরিয়ে আসবার নিরন্তর ব্যর্থ চেষ্টায়, তা হচ্ছে : যা রটে তার সবটাই কি বাজে ? কিছুটা কি বটে নয় ?

অর্জুন সিং, আমাদের অভিজ্ঞতাব বিবরণ দিতে, বলল নলিনীর সঙ্গে শঙ্কব যতই নির্লজ্জ হোক, তার জন্যে অর্জুনের এতটুকু আপত্তির নেই কিছু ; লোকেব কথা যদি সবটাই সত্যি হয় তাতেও নয়। কারণ রাতের পর রাত গায়ে গা ঠেকিয়ে অভিনয় করতে করতে যে কোনও রক্তমাংসেব শরীরে আগুনে লাগার কথা। কিন্তু তাজ্জব হয়ে গেল সেইদিন, যেদিন শঙ্কবকে দেখলো সে পুষ্পর সঙ্গে তার গাড়ীতে উঠ্‌তে ; এবং তারও কয়েকদিন পরে নলিনীকে মদনের সঙ্গে আরেক গাড়ীতে। অর্জুন সিং রাতে শুতে যাবার আগে প্রশ্ন করেছিলো, সেদিন মনে আছে তাব আজও, ভগবান কি নেই ? যদি থাকেন তো এতো পাপ তিনি সইছেন কোন্ দুর্বলতায় ? কিন্তু ভগবান যে আছেন, —অর্জুন সিং তাব প্রমাণ পায় পরের দিনই।

কি রকম ?—কৌতুহল আর চেপে রাখতে না পেরে প্রশ্ন করি।

পরের দিন শঙ্কর আর পুষ্প অর্জুন সিংকে গাড়ীটাকে অন্ধকার ময়দানের নিরিবিলিতে নিয়ে যেতে বলে।

ময়দানের অন্ধকারে গাড়ী লাগাতেই মাঠের ভিতর থেকে উঠে আসে আরও একজোড়া কপোত-কপোতী। তাদের কাছে ময়দানের প্রয়োজন তখন ফুরিয়ে গেছে বোধ হয়; রাত হয়ে গেছে,—তাই ট্যাক্সী দেখে এগিয়ে এলো তাড়াতাড়ি। শঙ্কর আর পুষ্প তাদের পরিত্যক্ত সেই ময়দানকে আশ্রয় করবার জন্যে পা বাড়াতে গিয়ে থেমে যায়; অন্য দু'জন যারা ময়দানের দিক থেকে এসে ট্যাক্সীর নিরাপদ বন্দরে নিজেদের নোঙর করবে বলে পা ওঠাতে যাচ্ছিলো, —থেমে যায় তারাও।

দু'জোড়া প্রেমিক পাখীই পরস্পরের সাক্ষাতিক চেনা যে; ট্যাক্সী থেকে বেরুবার যারা তারা যেমন শঙ্কর-পুষ্প, এতে ভুল হবার জো ছিলো না ময়দান থেকে আগত জোড়াব চোখে, তেমনই তারাও যে মদন চৌধুরী-নলিনী দাসী, সরি, দেবী ছাড়া আর কেউ নয় এ বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহেব অবকাশই বা পৃথিবীতে সেদিন কোথায় ছিলো!

অর্জুন সিং বলেছিলো: ভগবান আছেন কি নেই এরপর আর তা নিয়ে আমাব মাথা ঘামাবার প্রয়োজন হয়নি কোনও দিন। কিন্তু আমার হয়েছে; আমি না বলে পারি না, তুমি সেদিন শঙ্কব-পুষ্পকে সেখানে পৌঁছে দেবার আগে আরও একবার সেখানে গিয়েছিলে এবং মদন-নলিনীকে বলে এসেছিলে এক ঘণ্টা বাদে আবার তুমি সেখান থেকে তাদের তুলে নিয়ে আসবে!—বলো, ঠিক বলেছি কিনা?

অর্জুন আমার কথার জবাব দেয় না; চিরা-চরিত প্রথায় তার চোখকে অনুসরণ করে আমার চোখ যেখানে গিয়ে পড়ে সেদিকে তাকিয়ে যা পড়তে ভুল করে না আমার চোখ তা হচ্ছে এই রচনার শিরোনামা: ট্যাক্সীর মিটার উঠছে।

দশ মিনিটের বিরতি

শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতের কালে অর্জুনকে দেখিয়েছিলেন বিশ্বরূপ। তাতেই কাজ হয়েছিল; অর্জুন ফেলে দেওয়া গাণ্ডীব তুলে নিয়েছিলেন আবার। স্বাধীন ভারতে অবশ্য শুধু শ্রীকৃষ্ণ নেই; শ্রীকৃষ্ণ আজ হয় মেনন, নয় সিংহ। যদি শুধু শ্রীকৃষ্ণও থাকতেন তাহলেও শুধু মুখ হাঁ করলেই অর্জুন তার মধ্যে বিশ্বরূপ দেখতে পেতেন কিনা সন্দেহ; স্বাধীন ভারতে বরং শ্রীকৃষ্ণকে শরণ নিতে হত অর্জুনেরই; শুধু শ্রীকৃষ্ণের মতোই শুধু অর্জুন আজকের যুগে সত্যজিৎ রায়ের আবির্ভাবের পর পুরানো পরিচালকদের মতেই সম্পূর্ণ অচল। পদবী চাই নামের ওপর; তারই ওপর নির্ভর করে আপনার পদ। পদবী থেকে যদি বোঝা যায় আপনি অমুকের নিয়ার রিলেশান তবেই শুধু কর্মস্থলে আপনার জন্য পদের সৃষ্টি অথবা উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। না হলেই, পদের পরিবর্তে বিপদের অনাসৃষ্টি আর না হয় পদত্যাগের বিভীষিকা অর্থাৎ মূলেই হাবাত আপনি। কেবল কর্মস্থলে নয়; স্কুলে আপনার ছেলের ভর্তি হতে পারা থেকে সাতখুন মাফ হওয়া তক এযুগের হিন্দুস্থানে সব নির্ভর করে যার ওপর তার নাম ওনলি শ্রীকৃষ্ণ হলে এবসুলিটলি য়ুসলেস; কিন্তু মেনন কি সিংহ হলে কেউ প্রশ্ন করবার নেই নেহরুর সবচেয়ে প্রিয়পাত্র মেনন আপনি না আপনি মেননজাইটিস ভারত সরকারের পক্ষে? আর সিংহ হলেও তোলার সাধ্য নেই কারুর এই অনধিকার সংশোধনী যে শ্রীকৃষ্ণ সিংহ বলতে আপনি আসলে কি বোঝাতে চাইছেন? বিহারের মুখ্যমন্ত্রী না আপনি সেই আসলে গর্দভচর্মাবৃত সিংহ?

ট্যাক্সীর মিটারে গোলমাল হয় না কখনও। শুনেই মুহূর্তে প্রসঙ্গের পট পরিবর্তন করে প্রশ্নকর্তা সেই লেখক ; অর্জুন সিংকে বড় রাস্তার ওপর মস্ত বড় বাড়ী দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেন : কত বড় বাড়ী দেখেছ ?

দেখেছি,—প্রশ্ন কোনদিকে এগুচ্ছে বুঝতে না পেরে জবাব দেয় ট্যাক্সীড্রাইভার।

লোহার গেট দেখেছ ?

জি হাঁ।

দরজায় দরোয়ান দেখেছ ?

হাঁ। হাঁ।

হাতে বন্দুক !

জরুর।

এই সবের পরেও তো বড় বাড়ীর বউ মেয়ে বাড়ী থেকে পালায় ; গোলমাল তো হয় কখনও কখনও !—আর তোমার ওই সামান্য মিটারে গোলমাল হয় না কখনও, এমন কখনও হতে পারে ?—তুমিই বলো—

বলে না কিছু আর অর্জুন সিং। সকলের পকেট মিলিয়ে যা হয় তাই নিয়েই খুশী হয় সে ; গোলমাল করে না মোটেই। অর্জুন সিং না হয়ে মাথায় যাদের সত্যিকারের শিং আছে তাদের চেয়েও নীরেট বুদ্ধি কোনও ড্রাইভারে হলে অবশ্য এমন গোল হত সেদিন সে মালের নেশা ছুটে যেত সেদিন সে অনতিবিলম্বে একথা অর্জুন সিং আমাকে না বললেও অথবা সেদিন তার ট্যাক্সীতে না থাকলেও অনুমান করতে পারেন অনায়াসেই এ কাহিনীর তথা বাঙলা গল্পের একমাত্র পাঠক যাঁরা সেই মহিয়সী মহিলা পাঠিকাও যে তাতে আর সন্দেহ কী ?

নিজের ঘরে পরমাসুন্দরী স্ত্রী থাকতেও লোকে কেন অন্য স্ত্রীলোকে মজে,—কখনও কখন অসম্ভব কুরাপায় তার উত্তর এখনও

পর্যন্ত অজানা। নিজের গাড়ী থাকা সত্ত্বেও কেউ কেউ কেন ট্যাক্সি করে, সে প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া খুব শক্ত নয় কিন্তু! কলকাতায় কেন, পৃথিবীর সর্বত্রই স্বনামধন্য মানুষের মতো, কখনও কখনও স্বয়ম্বর অথবা স্বরঙধন্য বাড়ী কিম্বা গাড়ী আছেই; চেনা বামুনের পৈতের মতোই এমন লোক আছে যার নামধামের প্রয়োজনই হয় না; গাড়ীর রঙ এবং নম্বর দেখেই রাস্তায় আবালবৃদ্ধবনিতা মুহূর্তে সচেতন হয় গাড়ীর মালিক কি এবং কে। এই গাড়ী করে যে কোনও মেয়ের বাড়ী; যে কোনও মানুষের বাড়া যাওয়া চলে; কিন্তু এই সুপরিচিত গাড়ীতে চেপে যাওয়া চলে না। কোন মেয়েমানুষের কাছে। সভ্যতার মুখোসে সে অসভ্যতার মুখ ঢাকতে কে বলে ম্যাক্সিফ্যাক্টরই সব চেয়ে বড় এ্যাক্টব; ট্যাক্সি নয় তার তুলনায় এব্যাপারে কিছুমাত্র গৌণ ফ্যাক্টর। যে সব স্থলে নিজের গাড়ীতে যেতে রাতেব অন্ধকারেও গগ্‌ল্‌স্‌ এঁটে চক্ষুলজ্জায় আটকায়; অকুস্থলের অনেক দূরে গাড়ী দাঁড় করিয়ে রেখে পায়ে হেঁটে যেতে হয় পদস্খলনেব ভয় সত্ত্বেও, ট্যাক্সিই সেখানে মুসকিল আসান।

কিন্তু কেবল সেখানেই কি? না। কলকাতায় এমন লোক সেদিনও ছিলো আজও আছে যারা ট্যাক্সি ছাড়া সূচ্যগ্র মেদিনী করে না অতিক্রম। লোকে তাদের উপদেশ দেয়; স্ত্রীলোকেও। ট্যাক্সিতে এত পয়সা না দিয়ে তার চেয়ে অনেক অল্পে অনেক আরামে নিজের গাড়ীতে যাওয়া যায় যত্রতত্র। মনে হয় বটে; কোনও কোনও যথেচ্ছ ট্যাক্সীবিহারীকে দেখে তাই বটে কিন্তু ভেবে দেখলে এমন কথার মানে হয় না কোনও। সে কলকাতায় যদি বা হোতো এ কলকাতায় একেবারেই নিরর্থক এই উপদেশ; এ এ্যাডভাইস দেশের লোকের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে বিদেশের ভিক্ষায় গম দিয়ে সমস্যা সমাধানের চাল মারার মতো ভাইস এ্যাড করা ছাড়া আর যা করে তা উল্লেখের যোগ্য নয়; কোন ক্রমেই

নয়। আজকের দিনে নতুন গাড়ীর মূল্য যখন হাত দিয়ে ছোয়া যায় না; ড্রাইভারের মাইনে যখন চারজন প্রাইভেট টিউটরের তুলনাতেও বেশী; পেট্রলের মাপ যখন লিটারে নামছে এবং দাম বাড়ছে গীটারের পঞ্চমে; দুর্ঘটনা হলে রাস্তায় যখন গাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া এবং গাড়ীর মালিকের [মালিকই চালক হলে তো সোনায় সোহাগা] খুলি উড়িয়ে দেওয়াই প্রথম কর্তব্য গণতন্ত্রে তখনও যে গাড়ী করতে চায় নিজের তাব উদ্দেশ্য স্পষ্ট; অতিরিক্ত মুনাফা ট্যাক্সের রাস্তায় অথবা ট্যাক্সীর মীটারে না দিয়ে গাড়ী শাড়ী গয়নার গর্ভে দেওয়ার এই বিকৃত মনোবৃত্তির মূলোৎপাটন অসম্ভব হবে ততদিন যতদিন রামরাজ্যে অসংখ্য লোক সব দিক দিয়ে রিক্ত রইবে এবং ভাগ্যবান অল্প দুচারজন প্রয়োজনের অতিরিক্ত লুটবে দু'হাতে ততদিনই এ্যাডাল্ট্ ফ্র্যানচাইস্ড্ স্বাধীন ভারতে লক্ষ লক্ষ লোক থাকবে বেকার এবং লক্ষপতি কয়েকজন কালো বাজারীর দরজায় খাড়া রইবে স্টুডিবেকার।

এদের কথা নয়। এরা চিরকাল ছিলো; এরা চিবকাল থাকবে। মাথায় গান্ধী টুপি; পরনে জহরকোট মুখে রাজেন্দ্র প্রসাদের হিন্দিব কল্যাণে সরকারের সুয়োরানীদের কথা বলছি না। আমি বলছি মধ্যবিত্তদের হয়ে; সেই সব মধ্যবিত্ত যারা হাজারে পা দিলেই মাইনে কত না বলে, বলে, এখন ফোর ফিগারে রোজগার করছি; কিছুদিন আগে যখন ট্রেনে মধ্যবিত্ত শ্রেণী অর্থাৎ ইন্টার ক্লাস বাতিল হয়নি তখন তাদের কামরায় একটু গেঁয়ো কি ময়লা জামা কাপড় পরে এলেই কা কা করে চীৎকার করে উঠতো দেড়া ভাড়া,—ইধার নেই। হাজারের গর্ভে পা দিলেই ঢোড়া নয় আর; কেউটের ল্যাজে পা পড়ে মধ্যবিত্তের তখন; সে আর শুধু মধ্যবিত্ত থাকে না; তখন সে মুহূর্তে উত্তীর্ণ হয় উচ্চ মধ্যবিত্তে। গাঁদার গায়ে লেবেল ওঠে মেরিগোল্ড্; গোঁসাই হয় তখন থেকেই Gossain; পাশের বাড়ীর পক্ষি হয় ফিঁয়াসে।

নশ'নিবানব্বই টাকা নিরানব্বই ন. প. পর্যন্ত ভয় নেই। একের পব তিন শূন্যিতেই যাদের পদস্খলন সুরু তারাই বাঙালী। বেচারী জানে না যে এখনকার হাজার আগেকার দুশো বা আরোও কম। জানে না বলেই পাগড়ী ত্যাগ কবে গাড়ীতে পা দেয়. পুরানো গাড়ীতে। এবং চোরা বালিতে পা দিয়ে উঠে আসবার যদি বা উপায় থাকে গজের তবুও পুরানো গাড়ী কিনে নিঝঞ্ঝাটে দিন চালাতে গিয়ে হাড়ির হাল হয় বাঙালী দিগ গজের। দুটি সংসার হয় তখন। বউ এর অসুখ; ছেলে মেয়ের জামাকাপড় থেকে সুরু করে হলিকস কাম জনসন বেবি পাউডার টু স্কুলের খাতা বই প্লাস ড্রেস প্যারেডেব মতই পুরানো গাড়ীর মেরামতেরও বাই অনেক। আজ আওয়াজ হচ্ছে; কাল আওয়াজ হচ্ছে না। আজ ব্রেক ধরছে না; কাল ডিফারেন্সিয়ালে গোলমাল। কার্বুরেটারে ময়লা তো বাচ্চাব সর্দিব মতোই নিত্যনৈমিত্তিক। এলোমেলো ভাবেও হাত পা ভাঙার মতোই মধ্যে মধ্যেই অধর্তব্য ডাইগোনাইজ অসম্ভব ব্যাধি তো আছেই। সবোপরি আছে সকালেই আর্তনাদ। সেল্‌ফ নিচ্ছে না। মনে হয় জীবনজাজ্জ্বাস্থ সক্রেটিসের নিশ্চয়ই পুবানো গাড়ী ছিলো, না হলে বেরিয়েছিলো কি করে অমন বক্ষচেরা বিশ্ববাণী: know thy self!

পুবানো গাড়ীব চেয়ে নতুন বেবি ট্যাক্সী সেই কারণেই ক্লাসিক্যাল গানেব তুলনায় বম্যগীতির মতো অনেক কমফর্টবেল অনেক লেস দুঃসহ। যখন পকেটে পযসা আছে তখন বেবিব পিঠে সওয়াব হন; পযসা না থাকলে পবেব নট্ ট্রান্সফারেবেল ট্রামের মান্থলীতে চালান কাজ। কেউ জিজ্ঞেস করবে না একট্রাম লোকের ভীড়ে: আপনাব গাড়ী কি হলো? অথবা মিথ্যের পর মিথ্যে বলতে হবে না আপনাকেও: গাড়ী কারখানায় দিয়েছি! একজনের পয়সায় না কুলোয়,—চারজনেব পকেট এক করে একখানা বেবি ট্যাক্সি করুন; আধঘণ্টার পথ পাঁচ মিনিটে; অন্ধ কূপহত্যার

শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশের পরিবর্তে আনুন ফুরফুরে হাওয়ায় স্ফূর্তির মেজাজ। ট্যাক্সী চাপা যারা অপব্যয় বলে মনে করে তারা সময় শক্তি এবং আয়ুক্ষয়কে ব্যয় বলে ধরে না; "প্রাণ বাঁচানোর ভয়ে পয়সা বাঁচানোকে মনে করে মস্ত আয়। অর্থাৎ টিবি কেবল ক্ষয়রোগ; ডাইবেটিস কিন্তু অক্ষয় রোগ! তাদেরই কৃপায় এই এক মিনিটের কাহিনীটি আরেকবার বিবৃত করি।

কর্তিত ভারতবর্ষে বুদ্ধির জন্যে যারা সব চেয়ে কীর্তিত সেই শিখদের একজন বাড়ী যাবে তাড়াতাড়ি বলে বাসে উঠতে গিয়ে বাস ধরতে না পেরে দৌড়তে লাগল বাসের পেছন পেছন। দৌড়তে দৌড়তে পৌঁছে গেল বাসায়। বউকে কেমন ভাবে বাসভাড়া বাঁচিয়েছে বলার পরও, অতঃপরও ভালবাসায় উপচে পড়ল না শিখজায়া। বরং বলল: তার স্বামী হচ্ছে একটি বুদ্ধু; বাসের পেছনে না দৌড়ে ট্যাক্সির পেছনে দৌড়লে কত তাড়াতাড়ি আসতে পারত সে; এবং বাঁচাতে পারত আরও কত পয়সা।

॥ শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্য ॥

এক

অর্জুন সিংএর ট্যাক্সীতে নাটকের চরম দৃশ্য উপস্থিত করবার আগে বলে নেওয়ার আছে একটুখানি।

যে সময়ের ঘটনা আমার এই কাহিনীর উপজীব্য সেই সময়, এখনও কারুর কারুর মনে থাকার কথা, একটি মামলা নিদারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে পুলিস আসামীকে ধরতে না পাবার কয়েক বছর পর আসল আসামীর নাটকীয় স্বীকৃতিতে। এবং সেই মামলায় যে পুলিস অফিসার সাজ্ঘাতিক সাধুবাদ অর্জন করে আদালত এবং জনসাধারণের উভয়ের কাছেই, আজ কবুল না করলে বিবেকের হাত থেকে এ্যাট লিস্ট আর রেহাই নেই আমার জানি। অর্জুন সিংএর গল্প ফাঁদতে বসার আজ এত বছর বাদে আর কোনও কারণ নেই আমার কেবল যে গুরুভার পাষাণ বুকে চেপে আছে এত দীর্ঘকাল, তাকে নামিয়ে ফেলে বোঝা হাল্‌কা হবার অভিলাষ ছাড়া আমি সর্বসমক্ষে এই স্বীকৃতিতে স্বাক্ষর দিচ্ছি যে, সে হত্যাকারীর কোনও কিনারা করতে না পেরে পুলিস হাল ছেড়ে দেয় হতাশ হয়ে, মামলা চালুই করতে পারে না কারুর বিরুদ্ধে, তারই আসল অপরাধীকে ফাঁসীকাঠে ঝোলানোর সব কৃতিত্ব সেদিন একা আমি গলার জয়মাল্য করেছি বটে, কিন্তু আজ আর বলতে বাধা নেই বটে যে তার পনের আনা তিন পয়সা পাওয়া উচিত যার আমার এই নাটকীয় কাহিনীর সে-ই হচ্ছে নায়ক; অর্জুন সিংএর যা পাওয়া উচিত ছিলো তা আত্মসাৎ করে এতকাল যে বৃশ্চিক দংশনে আমি জ্বলে পুড়ে মরেছি আজ অবসান হোক তার চিরকালের জন্যে।"

অর্জুন সিং-ই যে কেবল একা কৃতিত্বের প্রাপক, তা বললে অর্জুন সিংও আবার বিবেক দংশনে ক্ষত-বিক্ষত হবে। তার ট্যাক্সীর নীরব দাবী সোচ্চার হবে না কোনওদিন, এতেই হয়ত বিবেকদংশনের জ্বালা হবে আশীবিষদংশনের চেয়েও অধিকতর। অর্জুন সিংএর ট্যাক্সীতেই প্রায়-বিস্মৃত এই নাটকের মামলার যবনিকা উত্তোলিত হয় অতি নাটকীয় ভাবে। অর্জুন সিং নয়; অর্জুন সিংএর ট্যাক্সীই এই নাটকের নায়ক।

অর্জুন সিংএর অবিস্মরণীয় সেই যানে পা দেবারও কয়েক বছর আগে। সিঙ্গাপুর থেকে এক বিরাট ধনীর একমাত্র পুত্র স্বর্ণদেব সরকার কলকাতায় আসে কোনও এক ডিসেম্বারে। গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে এসে সে ওঠে যেদিন, সেইদিনই সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতায় অম্বিকা চৌধুরী লেনের একটি বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। যাত্রার উদ্দেশ্য ছিলো যে, সেই ঠিকানায় স্বর্ণদেবের মায়ের এক প্রিয় সখী পূর্ণিমা দেবী স্বামী পুত্র নিয়ে থাকতেন। পূর্ণিমার স্বামীর নাম যজ্ঞেশ্বর রায়; ছু'টি ছেলে এবং একটি মেয়ে নিয়ে যে ঠিকানায় তিনি থাকেন বলে স্বর্ণদেবের মা চিঠি দেন ছেলের সঙ্গে, সে ঠিকানায় পুলিস যজ্ঞেশ্বর-পূর্ণিমাদের পায়নি। পুলিসের সাহায্যে ঠিকানা খুঁজে বেড়ানোর কারণ, স্বর্ণদেব সেই সন্ধ্যেয় বেরিয়ে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে আর ফিরে আসেনি। হোটেলই পুলিসকে ব্যাপারটা জানায়। সিঙ্গাপুর থেকে স্বর্ণদেবের মা—নীলাব্জসুন্দরী; বাবা—মহাদেব সরকার এবং স্বর্ণদেবের একমাত্র বোন কণিকা কলকাতায় আসে পাগলের মত। সিঙ্গাপুরের এই ধনকুবের এবং প্রবাসী বাঙালীর অর্থের মহিমায় হৈ-হৈ পড়ে যায় লালবাজারে; পুলিসের সর্বোর্ধ্বতন মহলে। কলকাতার কাগজে কাগজে ছেয়ে যায় স্বর্ণদেবের ছবি এবং নিরুদ্দেশের কাহিনী; যজ্ঞেশ্বর-পূর্ণিমার উদ্দেশ্যেও প্রচারিত হয় বিজ্ঞপ্তি।

যজ্ঞেশ্বর রায় পুলিশের কাছে আসে; এবং জানায় যে স্বর্ণদেব

তার ঠিকানায় সেই সন্ধ্যায় উপস্থিত হয়। এবং রাতে সেখান থেকে বিদায়ও নেয়। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কেবল কলকাতার নয় পৃথিবীর পুলিসের কাছেই ঘোরালো হয়ে দাঁড়ায়। স্বর্ণদেবের বাবার বিপুল অর্থ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সাহায্যও যাচ্ঞা করে; তারাও কোনও সমাধানের পথ খুঁজে পায় না। বাঙলা গল্পের একমাত্র পাঠক যারা সেই পাঠিকারা তো বটেই,—দুনিয়া জুড়ে যারা বয়সে সাবালক কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিতে নেহাতই বালক, সেই গ্রোণআপ চিলড্রেন অর্থাৎ দাড়ি দেখা দিয়েছে বলেই যাদের বাচ্চা বলা যায় না আব অথচ রুচির বিচারে যাদের সদ্যোজাত বললে অত্যুক্তি হয় না মোটেই, সেই তামাম দুনিয়ার গোয়েন্দা-পুস্তক-প্রিয় পাঠকরাও বক্ষ্যমান সত্য ঘটনার বিবৃতিকারকে নিরুপায় জেনে ক্ষমা করবেন। কোনও রবার্ট ব্লেক কি শার্লক হোমস্; ফাদার ব্রাউন কিম্বা পয়রোঁ; হয় ওপেনহিম, নয় এডগার ওয়ালেশ আর নয় মরিসডি কোব্রা; অথবা লেটেস্ট মডেল বেমণ্ড শ্যাণ্ডলাব, ডরোথা এল শেয়ার্স; বা এদেরই অক্ষম মেড ইন ইণ্ডিয়া-সংস্করণ প্রতুল লাহিড়ী, ব্যোমকেশ, কিরীটি রায় এদেব মত কাউকে উপস্থিত করতে পারলে মুহূর্তে সব সমস্যা একটা সিগারেট ফোঁকার চেয়েও কম সময়ে উড়িয়ে দেওয়া যেত।

উড়িয়ে দেওয়া যেত যে তার প্রমাণ সেই অসমাপ্ত ক্রাইম সিরিয়ালের লেখক যে ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছিল তার গল্পের নায়ককে এমন অবস্থায় ফেলে, যেখান থেকে বেরুবার আর এক কপর্দক উপায়ও রাখেনি সে নিজেই। গল্পকে এইখানে এনে সেবারেব লেখার শেষে, 'পরের সংখ্যায় এরপরে কি হলো দেখুন,'—থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে বর্জাইসে দেগে একমাসের লম্বা ছুটি নিয়ে ভেগেছে যখন সিরিয়ালের জগদ্বিখ্যাত স্রষ্টা তখন সারা কাগজের অফিসের ম্যানেজিং এডিটর, এডিটর থেকে ছারপোকা পর্যন্ত হুমড়ি খেয়ে পড়েছে লেখাটার ওপর; ভেবে পাচ্ছে না এই অবস্থা থেকে, কি

করে মুক্ত করবে নায়ককে তার স্রষ্টা, যে দুরবস্থা থেকে স্বয়ং জগৎস্রষ্টা ভগবানকেও বার করে আনা অসম্ভব ছিলো পুরাণেও। সব রকম সম্ভব অসম্ভব মুক্তির উপায় চিন্তাতেও হালে পানি না পেয়ে অফিসের ফার্নিচারসুদ্ধ নাজেহাল যখন তখনই কেবল ফিরেছে সিরিয়ালের স্রষ্টা তার ডেস্কে বিশ্রামোপভোগের পর; সেই মাত্র। কলম তুলে নেবার আগেই ঝুঁকে পড়েছে সারা কাগজের অফিস মায় দেওয়ালের টিকটিকিটা পর্যন্ত; কি লেখে, কি করে বার করে নায়ককে? রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা তাদের; কিন্তু জিপ স্ক্যাণ্ডাল, আর্মিতে অন্তর্বিরোধ, অথবা নানাবতী স্ক্যাণ্ডালের পরেও নির্লিপ্ত নেহরু-মুখ সেই সিরিয়াল লেখকের মুখে নেই ভাবনার চিহ্ন; কপালে নেই দুর্ভাবনার একটি বলি-ও।

কলম তুলে নিল তেমনই অক্লেশে যেমন অনায়াসে হাতে তুলে নেয় ছোট ছেলে ঘুমের চোখেও ব্র্যাকেটের নীচে পেরেক ঝোলানো টুথব্রাশ। তারপর সিগারেটে টান দিয়ে বসালো: The hero jumped and ran away........। অপেক্ষমান জনতাও দীর্ঘ-প্রতীক্ষার অপ্রত্যাশিত পরিণতিতে সামিট কনফারেন্সে আগত সাংবাদিকের কায়দায় মুহূর্তে জাম্প্‌ড্‌ এণ্ড রান এওয়ে। সাতকাণ্ড সিরিয়াল পাঠের পরেও তাদের কেন স্ট্রাইক করেনি যে অবস্থায় অন্য যেকারুর আঙুলের ডগা নড়ানো অসম্ভব, সে অবস্থাতেও গোয়েন্দা গল্পের নায়কের পক্ষে খুবই সম্ভব এই ভাবে বিবৃত হবার, যে: The hero jumped and ran away!

অর্জুন সিংএর ট্যাক্সীতে একদিন যে নিখোঁজ আসামীর পাত্তা মেলায় যবনিকা উত্তোলিত হয় পরিত্যক্ত পুলিশ কেসের সেই ঘটনা, যেহেতু গোয়েন্দা কাহিনীর দুর্ঘটনা নয়,—জীবনেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ সেই হেতু সখের গোয়েন্দার সাহায্য নিয়ে পাঠকের এবং তার চেয়ে অনেক, অনেক বেশী পাঠিকার মনোরঞ্জনকর ক্লাইম্যাক্স মুহূর্তে মিলনান্ত নাটকের অবতারণা করতে না পারার কারণ আর কিছু

নয়; কেবল এই যে প্রাইভেট ডিটেকটিভ বলে কোনও প্রাণী রিয়ল মার্ডারে কাজে লাগে না কোনওদিন; পৃথিবীর সব প্রান্তেই সখের গোয়েন্দারা ডিভোর্সেচ্ছু স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের অন্যে আসক্তির গোপন চিত্র সরবরাহ কাজে লাগে বড় জোর। আমাদের দেশে প্রাইভেট ডিটেকটিভ দেখা দেবে এবার; ডিভোর্সের বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছে,—তার ডালপালা দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই গোয়েন্দার প্রয়োজন হবে, পক্সে বহুলোক মারা যাবার পর যেমন এদেশে প্রয়োজনীয় মনে হয় টিকা দেওয়া; কর্পোরেশনেরও টনক নড়ে; দেওয়ালে দেওয়ালে পোস্টার পড়েঃ রোদনভরা এ বসন্ত কখনও আসেনি বুঝি আগে।

একারণই অবশ্য একমাত্র রিসন নয়। এর আসল কারণঃ Life is full of improbablities which fiction does not admit of. গোয়েন্দা কাহিনীতে যা ঘটে জীবনে প্রায়ই তা যেমন ঘটে না, তেমনই জীবনে এমন অনেক অঘটন আজও ঘটে যা গোয়েন্দা কাহিনীতে ঘটতে দিলে গোয়েন্দাকাহিনী আর তেমন হয় না যেমন হলে গোয়েন্দাকাহিনী পাঠকের চেয়ে বেশী পাঠিকার মনের মত হয়।

এর সব চেয়ে হাতের কাছে যে নজীর তাই হচ্ছে স্বর্ণদেব সরকারের অন্তর্ধান রহস্যের মূল। ব্যাপারটা অনুধাবন করে দেখলে বোঝা যাবে আমার বক্তব্যের মর্ম। স্বর্ণদেব সিঙ্গাপুর থেকে কলকাতায় সদ্য আগত সেদিন। যজ্ঞেশ্বর রায়ের যে ঠিকানায় সেদিন সে বেরিয়েছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে, সেই ঠিকানা সে অনেকদিন আগেই বদলেছে; স্বর্ণদেব যজ্ঞেশ্বরের পুরানো ঠিকানায় উপস্থিত হলে একজন যজ্ঞেশ্বরের নতুন ঠিকানা দেয়। পুলিসের কাছে সে স্বীকার করেছে সে-কথা; এবং সনাক্ত করেছে স্বর্ণদেবের ছবি দেখে সে; যার ছবি সে-ই সেদিন তার বাড়ীতে যজ্ঞেশ্বরের খোঁজে গিয়েছিল; যজ্ঞেশ্বর পুলিশের কাছে বলেছে যে স্বর্ণদেব তার ঠিকানায় শেষ পর্যন্ত যায়; যে ট্যাক্সীতে

করে ফেরে স্বর্ণদেব তার কোনও পাত্তা পাওয়া যায়নি। সে রাতে স্বর্ণদেব যজ্ঞেশ্বরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আর ফিরে আসেনি; গ্রেট ইস্টার্নে সে রাতে কলকাতায় ঐতিহাসিক ঝড়ের রাত বলে এখনও কারুর কারুর স্মরণে থাকার কথা। সে রকম ঝড় বৃষ্টি জব চার্ণকের প্রিয় নগরীর ইতিবৃত্তে বেশীবার হয়নি।

এই পরিস্থিতিতে স্বর্ণদেব খুন হয়েছে কি না আদৌ—এবং খুন হয়ে থাকলে যজ্ঞেশ্বর অথবা আর কে তার হত্যাকারী তা বার করা পৃথিবীর বুদ্ধিমানতম পুলিসের পক্ষেও বার করা সম্ভব কি,—এই প্রশ্ন আমি সর্বাগ্রে তুলছি। এবং আরেকবারের বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে ঘটনাটা গোয়েন্দা সিরিজের অন্তর্গত কল্পিত কাহিনী নয়; জীবনের এক আশ্চর্যর টুকরো এই হত্যার দুর্ঘটনা। ফিকশন হলে পুলিসের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিমান কোনও প্যারী ম্যাসন শেষ পর্যন্ত হাতে কড়া পরিয়ে দিত কারুর হাতে; আসলে হত্যার দাগ না থাকলেও অকাট্য যুক্তির জাল কেটে বেরুবার রাস্তা যার, সেই নিরপরাধ ব্যক্তির তো বটেই,—কোন পাঠকেরও জানা নেই। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা যেহেতু ফিকশান নয়,—ফ্যাক্ট,—সেই হেতু শেষ পর্যন্ত সহজ হলো না আবিষ্কার করা হত্যাকারীকে। এবং পুলিস একসময়ে চুপ করে গেল; আস্তে আস্তে ফেড আউট করল হত্যার উত্তেজনা খবরের কাগজ পড়ুয়ার স্মৃতির পর্দা থেকে। শেষ পর্যন্ত হয়ত রহস্যই থেকে যেত স্বর্ণদেবের নিরুদ্দেশ, কিন্তু ফ্যাক্ট ইস ষ্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন! শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে পড়ল যে স্বর্ণদেব সে রাতে নিহতই হয় এবং স্বর্ণদেবের হত্যাকারী কে আত্মপ্রকাশ করে তার পরিচয়ও। এখন সেই আসল ছবি,—মেন ফিচার সুরু করি আর দেরী না করে। ডকুমেন্টারী, নিউজরীল, আগামী ছবির ট্রেলার, এবং বিজ্ঞাপনের স্লাইডের পর স্লাইড প্রদর্শনে সম্ভবতঃ ইতিমধ্যেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছি বসুন্ধরার চেয়েও সর্বংসহা, রহস্যকাহিনীর পাঠিকার।

হ্যাঁ; আরেকটা কথা। অর্জুন সিং যদিচ এই রহস্যের অন্তরালে আমার পুরস্কার এবং খ্যাতিপ্রাপ্তির ইনডিসপেনসিব্‌ল্‌ ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে; এবং সেই সত্যি কথা বলতে আমাকে জানিয়েছে স্বর্ণদেবের হত্যাকারী কে; জানিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। তাকে হাতে-নাতে ধরতে যে এতটুকু বেগ পাইনি তার মূলেও ওই অর্জুন সিং। না। অর্জুন সিংএর ট্যাক্সীতে পা না দিলে এ রহস্যের মর্মোদ্ঘাটনের মুহূর্তে আমি পৌছতে পারতাম না; তাই অর্জুন সিং নয়,—তার ট্যাক্সীর কাছেই আমি কৃতজ্ঞ আছি। তবে অর্জুন সিং যেভাবে এই রহস্যের সূত্র আমার কাছে উপস্থিত করেছিল, আমি সে কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করতে বসে পাঠিকাব কাছে রকম-ফের করেছি। করতে বাধ্য হয়েছি বলাই সঙ্গত। কারণ সে বলেছিল জাবনের গল্প; আর আমি যা সার্ভ করছি তা কাহিনা।

জীবনের গল্প জীবনের ট্রু কপি হয় না, হলে তা জীবনও হয় না, গল্পও হয় না। গল্প যে ভাবে ঘটে ঘটনাগুলো পরপর, জীবনে তা কদাচ ঘটে। জীবনে যা আগে ঘটে গল্পের খাতিরে তাকে পরে নিয়ে যেতে হয়; যার পরে আসার কথা সে আসে জীবনভিত্তিক কাহিনীতেও দুম করে এগিয়ে। অর্জুন সিং আমাকে যে ঘটনা বলে এবং যার থেকে স্বর্ণদেব সরকারের হত্যাকারীকে জানা যায়; নতুন করে সুরু হয়ে যায় খারিজ হয়ে যাওয়া মামলা,—তা সে যেভাবে বলেছিলো আমি সেভাবে এখানে তুলে ধরিনি। তুলে ধরলে তা জীবনের কপি হতো কিন্তু জীবন্ত গল্প হতো না কিছুতেই। কিন্তু যা আসলে ঘটেনি তা আমিও এ গল্পে ঘটতে দিই নি; অর্জুন সিং যদি নিজে এ গল্প লিখতে পারতো তাহলে তাকেও যে পরিবেশটুকু সৃষ্টি না করলে গল্প করতে হতো না, কেবল সেই পরিবর্তনটুকুই আমি ঘটিয়েছি; তার কম নয়; বেশি নয়। অর্জুন আমার এ গল্প পড়লে অনুমোদন করত। এ্যাটলিস্ট লেখকদের গল্প ছায়াচিত্রের রজত পটে যেভাবে খোল নলচে পালটে উপস্থিত হয়, এবং ছবি

চললে যা দেখেও বাঙালী লেখকরা দেখেন না; কিন্তু ছবি না চললেই কাগজে কাগজে স্টেটমেন্টের পর স্টেটমেন্টে আর্তনাদ করে ওঠে,—সে ভাবে কিছু করার অভিযোগ অর্জুন কিছুতেই বর্তমান লেখকের বিরুদ্ধে আনতে পারতো না।

অর্জুন সিং যে ভাবে উপস্থিত করছিলো ঘটনাবলী তা থেকে আমি সে ছবি যেভাবে মনের চোখে ভেসে উঠেছিলো আমার; যেমনভাবে পরপর সাজালে জীবনের চলচ্চিত্র অবারিত হয় পাঠিকার দৃষ্টিতে তেমনইভাবে সাজিয়ে দিয়েছি এখানে; এভাবে না বলে অর্জুনের মতো করে বললে তা পুলিশের রিপোর্ট হতে পারতো; রিটায়ার্ড পুলিস অ'ফসারের লেখা রম্য রচনা হতে পারত অনায়াসে, কিন্তু আমি যা দিতে যাচ্ছি তা হতো না, এর থেকে সব পেত পাঠিকা, পেত না শুধু রামায়ণে সীতা হরণের কাহিনী পাঠ করে যা পায় সকলে এবং যার জন্যে পড়ে গল্পের বই তাই,—তারই নাম রস। লেখার একমাত্র উদ্দেশ্য এই রস সঞ্চার।

॥ দুই ॥

পূর্ণ চৌধুরী লেন কলকাতার অসংখ্য মধ্যবিত্ত গলির একটি ছিলো একদিন। একদিন ছিলো; এখন আর নেই। দক্ষিণ পূব কলকাতার এই গলির দু'পাশের বাড়ি ভেঙে চুরমার করে, এই রাস্তাকে চওড়া করে প্রায় তিন গুণ, এবং এর দু'পাশের নতুন করে তুলে আকাশে আঁচড়কাটা সৌধ, ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট পূর্ণ চৌধুরী লেন যে এখানে একদিন ছিলো তার এক টুকরো প্রুফও আর রাখে নি। সেই গলির একটি মধ্যবিত্তের বাড়িতে বাস করতেন যজ্ঞেশ্বর রায়; স্ত্রী, এক ঢোল—এক কাঁসি অর্থাৎ এক ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে। যজ্ঞেশ্বর চাকরি করতেন শেয়ার বেচা-কেনা করে সে-যুগে বিখ্যাত রায় এণ্ড সাদারল্যাণ্ড কোম্পানীতে; মাইনে সে

যুগের পক্ষে নেহাৎ খারাপ কেন, বেশ ভালই ছিলো। এ ছাড়া তার পাঁচ সাত বছর আগে পর্যন্ত সামান্য পৈতৃক গভর্ণমেণ্ট পেপারও হাতে ছিলো। মদের দোকানে অথবা রেসের বুকির কাছে কাজ করতে করতে সঙ্গদোষে কারুর কারুর কখনও কখনও যা হয় যজ্ঞেশ্বর রায়েরও তাই হয়েছিল। তিনি রাতারাতি বড় লোক হবার দুরাশায় শেয়ার খেলতে সুরু করে একসময়ে শেয়ার কিনেছিলেন তাঁর সঙ্গতির তুলনায় কিছু মোটা অঙ্কের; শেয়ারের দাম ওঠার বদলে বাইশ টাকার মতো পড়ে যাওয়ায় ডিফারেন্স মিটোতে পৈতৃক গভর্ণমেণ্ট পেপার তাঁর একে একে সবই হাতছাড়া হয়ে যায়। যতদিন পৈতৃক কুঁজোয় জল ছিলো ততদিন মাসের শেষে যে মাইনে পেতেন তাতে সচ্ছল ভাবে দিন চলতে আটকায় নি; আটকালেই কুঁজোব জল নিবারণ করেছে তৃষ্ণা। অল্প অল্প ইনসিওরও করাতেন লোককে যজ্ঞেশ্বর রায়; তার ফলে পৈতৃক কুঁজো থেকে যে জল টানতেন তা আবার জলপূর্ণ করতে কিঞ্চিৎ দেরী হতো, কিন্তু সে দেরী দুঃসহ হতো কদাচ।

পৈতৃক কুঁজোর জল রাতারাতি ফাটকায় দিয়ে এসে নিজেই জল ধরলেন যজ্ঞেশ্বর। অর্থাৎ অল্প অল্প করে নেশা করতে সুরু করলেন তিনি। ক্রমে এমন হলো যে রোজ একটু মদ না খাওয়া পর্যন্ত ঠিক থাকতে পারেন না আর; ঐ সময়টুকুই বেশ মৌজে থাকতেন এবং মৌজ কেটে এলেই বাড়িতে প্রথম প্রথম কেবল স্ত্রীর ওপর, তারপর ছেলেমেয়েদের ওপর; এবং সবশেষে সংসারের,—জগৎ সংসারের ওপরই বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠতেন যজ্ঞেশ্বর। নেই, নেই, নেই রবের মধ্যে ছেলেবেলা থেকে মানুষ হলে কিছু এসে যেত না; কিন্তু যৌবন-প্রায় অতিক্রান্ত স্টেজে নতুন করে যে কারুর পক্ষেই নেই-নেই রবের সঙ্গে এ্যাডজাস্ট করা শক্ত। তখনই মানুষ সংযত হবার বদলে বেপরোয়াই হয়; কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না সে যেভাবে এতকাল চলেছে সে ভাবে আর চলতে চাইলে অচিরেই,

দুয়ার হতে অদূরেই দণ্ডায়মান আছে এমন দুর্দিন যার সঙ্গে শেয়ার বেচা-কেনার কোম্পানীতে মোটামুটি মাইনের চাকরি নিয়ে লড়াই করার চেষ্টা; বাঘের সঙ্গে এয়ার গান নিয়ে সাক্ষাৎ করার মতোই নিছক অবিমৃষ্যকারিতা।

এবং ক্রমশঃই সেই দুর্দিন নিকটতর হলো।

ছেলেমেয়েদের স্কুলের মাইনে থেকে সুরু করে ঝি-চাকর, মুদি, গয়লা, এমন কি খবর কাগজওয়ালা পর্যন্ত ত্রিভুবনে এমন রইলো না একজনও যার কাছে না বাকী পড়লো; অথবা হাত পাততে হলো বউয়ের গয়না, মূল্যবান আসবাবপত্র থেকে নিজের কব্জি ঘড়ি, সোনার বোতাম, কিশোর বয়সে জেতা সোনার এবং রূপোর পদক,—মায় বাবার একমাত্র স্মৃতি সোনার নস্যিদানের কাছেও,—মর্তলোকে যতদিন ছিলেন যজ্ঞেশ্বরের পিতাঠাকুর বান্ধব রায় ততদিন এই নস্যির কৌটোতেই ধুকপুক করত যে তার প্রাণ,—এমন অভিযোগ বান্ধবের এমন বান্ধব কেউ ছিলো না যে না করেছে। সেই সোনার নস্যিদান যেদিন চলে গেল সেদিনই যে লক্ষ্মীর চলে যাওয়া সম্পূর্ণ হলো তার সংসার ছেড়ে, একথা মন ভেঙ্গে গেলেও যে মচকায়নি তখনও বাইরে সেই যজ্ঞেশ্বর স্বীকার করতে না চাইলে কি হবে, যজ্ঞেশ্বরের বউ শশীকলা তা বুঝেছিলো। মেয়েদের সাংসারিক বুদ্ধি কম,—একথা যাঁরা বলে থাকেন তাঁদের,—সেই সব জ্ঞানী ব্যক্তিদের বোঝানো যায় না কিছুতেই যে বুদ্ধির চেয়ে কখনও কখনও ইনটুাশন অনেক বড় সহায়; পুরুষরা বুদ্ধি দিয়ে সব বুঝতে গিয়ে কখনও নিজের সংসারে, কখনও জগৎসংসারে কোন বিপর্যয় এনেছে, অতিবুদ্ধির অ-মাহিমায় মরেছে এবং মেরেছে গলায় দড়ি দিয়ে। বুদ্ধি দিয়ে নয়; বুদ্ধির অতীত ব্যাখ্যা দিয়ে নারীই কেবল ঘ্রাণ নিতে পেরেছে অবশ্যম্ভাবী পরবর্তী বিপর্যয়ের। পুরুষের বুদ্ধি হচ্ছে সেই বস্তু যা চোর পালালে তবেই বাড়ে; ইনটুাশন নারীর সেই হৃদয়দর্পণ সেখানে coming events cast their shadows before.

তাই শশীবালা বুঝলেও, যজ্ঞেশ্বর রায় তখনও বোঝেননি,—অথবা বুঝতে চাননি। তখনও তিনি এর টুপি ওর মাথায় চাপিয়ে দুঃসময়ের বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার ব্যর্থ চেষ্টায় ভরাডুবির মুহূর্তটিকেই কেবল সন্নিকটতর করছেন দ্রুত লয়ে। দরোয়ানের কাছ থেকে সুদে টাকা ধার করে অফিসের ক্যাশ থেকে না বলে নেওয়া টাকা হিসেব হবার আগে রেখে দিচ্ছেন; কাবুলীর আরও চড়া সুদে ধার দেওয়া টাকায় দরোয়ানের পাওনাগণ্ডা মিটোবেন বলে নিয়ে মিটোতে পারছে না; আরও অপরিহার্য আরও জরুরী সংসারের তাগাদা, অর্থাৎ হাঁড়ি চড়ার সমস্যার বিরাট হাঁ ভর্তি করতে বাধ্য হচ্ছেন। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পরিচিত, প্রায় পরিচিত কখনও কখনও সদ্যপরিচিতের কাছেও হাত পাততে পাততে সেইখানে এসে পৌঁছেছেন যেখানে দূর থেকে তাঁকে দেখতে পেলেই এ গলি ও গলি করে কেটে পড়ছে সবাই যে যেখান দিয়ে পারছে তখন। বাড়িতে বউ টাকার কথা না তুলতে পারে যাতে তার জন্যে মুখে কানে কিছু গুঁজেই বেরুচ্ছেন অফিসের তাড়ার বেনামে দূরে দূরে থাকে যেসব আপন জনেরা যারা, এখনও গন্ধ পায়নি তার দুরবস্থা তাদের কাছে। রাতে মাল খেয়ে ফিরছেন; মুখে দিছেন না কিছু। মাল খাচ্ছেন যখন তখন মনে পড়ছে শশীবালার সঙ্গে দুর্ব্যবহারের ফলে জলে ভরে যাওয়া দু'চোখে মনে পড়তেই, চোখের দু'কোণ দিয়ে যজ্ঞেশ্বরেরও গড়িয়ে পড়ছে প্রায়শ্চিত্তের উত্তপ্তধারা। বাচ্চা দুটো স্কুলে মাইনে দিতে না পারলে ক্লাসে ঢুকতে দেবে না বলায় একচড় দিয়েছেন একটাকে; আরেকটার কান মলে দিয়ে বলেছেন: ফের মিথ্যে কথা!' 'বারে! মিথ্যে কথা বলব কেন?'—কেঁদে উঠতেই দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে শশীবালা; হাত থেকে খুলে দিয়েছে শেষ সম্বল সোনার চুড়িজোড়া।

চুড়িজোড়া বাঁধা রাখবার সময়ে প্রতিজ্ঞা প্রবলতর হয়েছে; এই চুড়ি সময় পেরোবার আগেই ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে; যেমন

করে হোক, যেখান থেকেই হোক। সন্ধ্যের সময়, শিথিল থেকে শিথিলতর হতে হতে প্রতিজ্ঞা, শুঁড়ির দোকানে উড়ে যায় চুড়িবাঁধা দেওয়া সামর্থ্যের অনেকটাই। অনেক রাত করে বাড়ি ফেরে যজ্ঞেশ্বর সেদিন ; আশা করে, শশীবালা ঘুমিয়ে পড়েছে না খেয়ে। শশীবালা ঘুমোয়নি ; আকাশে নিদ্রাহারা শশীর মতোই জেগে আছে সে চুড়ির টাকা করার পথ চেয়ে স্বামীর উদ্দেশ্যে। যজ্ঞেশ্বর স্ত্রীকে দেখেই পকেট থেকে বার করে দেয় টাকা। টাকা গুণে শশীবালা বলে ঃ একি, এত কম কেন ? যজ্ঞেশ্বর চোখ থেকে চোখ তুলে নিয়ে শশীর জবাব করে ঃ বকেয়া সুদ কেটে নিয়ে দিয়েছে যে।' বলেই শুয়ে পড়ছিলো যজ্ঞেশ্বর ; শুতে পারলো না। হতভাগ্য যজ্ঞেশ্বর জানতো না যে সব চেয়ে নিরীহ, বসুন্ধরার মতই সর্বংসহা স্ত্রীও মিথ্যে নিঃশব্দে হজম করতে করতে একদিন উগরে দেয় সত্য শব্দ করে ; সেদিনই বসুন্ধরার বুক বিদীর্ণ হয় ; সেই শব্দে চিরে যায় আকাশের কান ; শশীবালা স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চোখ থেকে চোখ সরতে না দিয়ে বলে ঃ 'তুমি এই টাকায় মদ খেয়েছ ? ছিঃ !'

ঘুম ছুটে গেল যজ্ঞেশ্বর রায়ের। তারপর সঙ্ঘটিত হলো সেই মাল-খাওয়া মধ্যবিত্ত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এর সময়ে সব নাটকেই অনুষ্ঠিত হয় যা তারই গতানুগতিক পুনরাবৃত্তি। পূর্ণ চৌধুরী লেনের এই বাড়িতে কখনই কেবল এই নাটকের অনুষ্ঠান আগে সম্ভব হয়নি ; আজ প্রথম শশীবালার চুলের মুঠি ধরে মেঝেয় শুইয়ে দিলো যজ্ঞেশ্বর ; তারপর চড়, কিল, লাথি।

প্রথমে বাড়ির ছেলেমেয়ে জাগলো ; তারপর সাতপাড়ার ছেলেমেয়ে ; তার ওপরে আবালবৃদ্ধ বনিতা। পূর্ণ চৌধুরী লেনে এমন দৃশ্য ঘটেছে বলে মনে করতে পারলো না কেউ। ভেতরে তখনও চলেছে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর অঙ্গে সমানে সর্বপ্রকার আঘাত ; শশীকলার কণ্ঠে আর্তনাদ নেই ; আছে কেবল সেই এক কথার পুনরাবৃত্তি ঃ তুমি মদ খেয়েছ চুড়ি-বাঁধার টাকায়। ব্যস্। কথাটা

শোনে আর নতুন করে সুরু হয় মারের বর্ষণ। যখন ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে যজ্ঞেশ্বর তখনও শশীকলা তার স্লোগান ছাড়েনি। কাল সকালে আবার দেখে নেবে, শাসিয়ে বিছানায় ঢলে পড়ে যজ্ঞেশ্বর। মেঝেয় পড়ে যেমন মার খাচ্ছিলো তেমনই পড়ে রইলো মেঝে জুড়ে। ছেলেমেয়েরা আবার শুতে গেল; পাড়ার লোকেরাও একসময়ে! এবং একসময়ে যথারীতি রাত্রির অন্ধকার সমুদ্র সাঁতরে তীরেও উঠলো জবাকুসুমসঙ্কাশ দিবাকর স্বাভাবিক দীপ্তিতে। অনেক বেলায় যখন ঘুম ভাঙলো যজ্ঞেশ্বরের তখনও মেঝেয় পড়ে আছে রক্তাক্ত শশীবালা। নড়বার মতো শক্তিও নেই; চৈতন্যও লুপ্ত! ঘুম ভাঙতে যজ্ঞেশ্বরের মনে পড়লো না কাল রাতের শাসানির প্রতিজ্ঞা; ভাব বদলে সমবেদনায় টনটন করতে লাগলো তার বুক; অনুশোচনায়, বিবেকের দংশনে আশীবিষ জ্বালায় পুড়ে যেতে লাগলো প্রতি মুহূর্তে। বউএর মাথাটা কোলের ওপর তুলে নিয়ে ওষুধ লাগাতে বসলো; যন্ত্রণা ভোলবার বাম। ডাক্তার ডাকলো নিজেই; ছেলেমেয়েদের তদারক—তাও, ছেলেমেয়ে অবাক হয়ে দেখলো, তাদের জীবনে মায়ের বদলে এই প্রথম সম্ভব হচ্ছে বাবার হাতে। না খেয়ে অফিস গেল; দুর্দান্ত আত্মশুচীর প্রায়শ্চিত্তে উদ্বুদ্ধ হলো; এবং তাতেই টিঁকে রইলো সন্ধ্যে পর্যন্ত। কিন্তু ঘড়িতে পাঁচটা বাজতে অন্যান্য কর্মী যেমন চঞ্চল হলো, কলম ফেলে ট্রাম ধরার আনন্দে; যজ্ঞেশ্বর রায়ও নড়েচড়ে বসলো শুঁড়ির দোকানের আকর্ষণে। তখনও মনের মধ্যে সুরাসুরের দ্বন্দ্বে মুহুর্মুহু আলোড়িত হচ্ছে যজ্ঞেশ্বর।

দুটি ছবি পাশাপাশি এসে দাঁড়াচ্ছে অনবরত। নিওন সাইনে যেমন একই কোম্পানীর তৈরী একবার সেলাইয়ের কলের আরেকবার পাখার ছবি ভেসে আসে;—তেমনই। একবার সকাল বেলার নরম আলোয় দেখা শশীকলার বেদনায় আর্তমুখ; আরেকবার সন্ধ্যেবেলায় শুঁড়ির দোকানের দুর্নিবার আকর্ষণ। প্রথমটার ছবি

ভেসে উঠতেই মন বলছে, না, আর মদ নয়। দ্বিতীয়টার মুখ স্পষ্ট হতে দুলে উঠছে মন : আজকে শেষবারের মতো, যাওয়া যাক না একবার। দ্বিতীয় চিত্র ফেড আউট করে প্রথম ছবি ইন করলে আবার, আবার না করেছে বিবেক। অঙ্গুলি সঙ্কেত করে নিষেধের লাল আলো দেখিয়েছে ; আজ গেলে আর বন্ধ হবে না যাওয়া কোনও দিনই ; ছেড়ে দিতে হলে মদ, নাও অ'নেভার। দ্বিতীয় মুখ উঁকি দেয় ফের প্রথম প্রোফিল বিদায় নিতে না নিতে ; এবং সেই অশুভ মুহূর্তেই পকেটে হাত ঠেকে যজ্ঞেশ্বরর এবং জয় হয়েছে সেই মুহূর্তেই দ্বিতীয় সত্তার। এর পর আর বিবেকের কাছেও তার জবাবদিহি করবার নেই কিছু ; দোষ যদি থাকে কারুর তো সে শশীকলার। কাল রাতে যজ্ঞেশ্বর যখন চুড়ি বাঁধা টাকার, মদ খাবার পর, বাকীটা তুলে দিয়েছিলো তখন সেটা আগে সরিয়ে না ফেলেই কেন কলহে প্রবৃত্ত করলো স্বামীকে। আজ শশীকলার সেবা করবার সময় মাথার কাছে পড়ে থাকা সে টাকাটা তাহলে কিছুতেই নজরে পড়তো না ; এবং নজরে না পড়লে নিজেব অজান্তে কখনও সে টাকা পকেটে করে অফিসে আসত না যজ্ঞেশ্বর ; এবং অফিসে না এলে দ্বিতীয় চিন্তার হতো না দিগ্বিজয় শেষ পর্যন্ত।

ছটা পর্যন্ত আত্মরক্ষা কবতে পেবেছিলো যজ্ঞেশ্বর রায় ; আর পারলো না। শুঁড়িব দোকানের উদ্দেশে পা চালালো হনহন-বেগে। বাড়ি ফিরলো অবশ্য অন্য দিনেব চে'য়ে তাড়াতাড়ি ; এবং ফিরে দেখলো এক বিঘৎ জটলা বাড়ির সামনে। গতকাল রাতে যে ভীড় হয়েছিলো তার কথা অবশ্য জানেই না যজ্ঞেশ্বর ; জানলেও এক বিন্দু স্মরণে নেই তার। আজকেব এই জটলা কেন তা অবশ্য জানতেই হলো। বাড়িওলার দারোয়ান সাত মাস বাকী ভাড়ার তাগাদায় এসে হাল্লা করার ফলেই মজা দেখতে জুটেছে প্রতিবেশীরা। যজ্ঞেশ্বর ফিরলো এবং নাটকের পরবর্তী অঙ্ক কি ঘটে দেখবার জন্যে উন্মুখেরা নিরাশ হলো পরের মুহূর্তেই। দারোয়ানকে নিরস্ত করতে একটি

কথাই যথেষ্ট হলো। যজ্ঞেশ্বর সোজা আদালত দেখিয়ে দিলো; এবং এমন টেনে নির্দেশ দিলো যেন সেই বাড়িওলা আর দারোয়ান ভাড়াটের লোক। 'আচ্ছা,'—বলে শাসিয়ে সেদিনকার মতো নাটকের ওপর যবনিকা টেনে বিদায় নিলো সেবার।

বাড়িওলা মামলা করলো শেষ পর্যন্ত; এবং ডিক্রিও পেলো। ডিক্রি পেয়ে জারী করতে আসবার আগের রাতে বাইরের ঘরে বসে আছে যজ্ঞেশ্বর; সামনের টেবলে বাচ্চা ক্যামেরা নিয়ে ছেলেমেয়েরা ঝগড়া করছে। বাইরে এমন বৃষ্টি যে রাস্তায় একটি লোক নেইতো বটেই,—দরজা জানলা এমনভাবে বন্ধ যে একছিটে আলো না বেরুনোর ব্ল্যাকআউটের রাত যেন। রাস্তার গ্যাসবাতিতে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে যায়নি কেউ। শশীকলা নীচে নেমে এসে তাড়া দেন ছেলেমেয়েদের: কি ক্যাচর ম্যাচর করছিস এখানে বসে? ওপরে শুতে যানা,—খেয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি। ঠিক সেই সময়ে তখন রাত নটা হবে কি হচ্ছে হচ্ছে। দরজায় কড়া নড়ে উঠলো দারুণ জোরে; আর বুকের ভেতরটা ধ্বক করে উঠলো যজ্ঞেশ্বরের। বাড়িওলা কি আজ রাতেই কোর্টের পেয়াদা পাঠালো নাকি ডিক্রি জারী করতে। উঠে দরজাটা খোলবার মতো পায়ে জোর পেল না সে। দরজার কড়া নড়ার ননস্টপ আওয়াজ নার্ভে গিয়ে লাগছে,—মোটর গাড়ির হর্ণ যেমন অনেক সময় থামতে ভুলে গিয়ে আশেপাশের কানে, বুকে, মাথায় গিয়ে লেগে জট পাকিয়ে দেয়; চিন্তা করবার ক্ষমতা পর্যন্ত কেড়ে নেয় মোমেন্টারিলি। শশীকলা স্বামীর অবস্থা বুঝে নিজেই গিয়ে খুলে দিল দরজা।

আর খুলে দিতেই প্রবেশ করলো যে এঘরের সঙ্গে তার মিল নেই কোথাও; শতছিন্ন পোষাকের পায়ে যদি জরির কাজকরা নাগরা উঠে তাহলে যেমন তার বিসদৃশতা এপারেন্ট হয় তেমনই বেমানান লাগল হাড়গোড় বার করা গতর এই বাড়ির সেই স্বল্পালোকে,—যেমন স্বাস্থ্য, তেমন মাপ, যেমন চওড়া, তেমন লম্বা,

যেমন পোষাকের তেমনই আভিজাত্যের পরিচয় সর্বাঙ্গে মুড়ে যে এসে দাঁড়ালো ঘরের মধ্যে; তাকে। দামী সুটের সর্বাঙ্গ দিয়ে জল পড়ছে ছাদ ফুটো হয়ে নামা বৃষ্টির মতো; যুবককে দেখে না শশীকলা, না যজ্ঞেশ্বর প্লেস করতে পারলো। ভাবলো,—ভুল ঠিকানায় এসে পড়েছে যুবক।

আমার নাম স্বর্ণদেব,—বলবার পরও আগন্তুকের সম্পর্কে ভাবান্তর ঘটলো না দেখে যুবক প্রশ্ন করে ঃ এটা যজ্ঞেশ্বর রায়ের বাড়ি না?

যজ্ঞেশ্বর ঃ হ্যাঁ; কিন্তু আপনাকে ঠিক—

যুবক ঃ আমাকে আপনারা ঠিক চিনে উঠতে পারবেন না; আমার মায়ের নাম নীলাব্জ; আমি সিঙ্গাপুর থেকে একঘণ্টা আগে কলকাতায় এসে উঠেছি গ্রাণ্ডে। মা বলেছিলেন, এসেই আপনাদের খোঁজ করতে; এখানে আর এমন একজনও নেই যাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে এতটুকু—

শশীবালা ঃ তুমি গঙ্গাজলের ছেলে?

শশীবালা কি করবে ভেবে পায় না।

নীলাব্জর ডাক নাম ছিলো উষা। সে আর শশীকলা; দুই অভিন্নহৃদয় সখী ছিলো আজ থেকে প্রায় দুযুগ আগে। মনে পড়ে যায় শশীকলার এক মুহূর্তের মধ্যে অতীতের সব। বিয়ের পর উষা যেদিন সিঙ্গাপুর যায়, উষার মামা-মামী যারা ছাড়া উষার সেদিন এজগতে এক নিজের বলতে শশীকলাই ছিলো, সেদিন উষার মামা-মামীর চেয়ে শশীকলা কেঁদেছিলো অনেক বেশী; অনেক আন্তরিক ছিলো উষার বিরহ তার ক্ষেত্রে। উষার মামা-মামীর নিজের মেয়ের বিবাহের বয়স হয়েছিলো কিন্তু বিবাহ হচ্ছিলো না প্রধানতঃ উষার কারণেই। সিঙ্গাপুর থেকে এসে যারা উষাকে নিয়ে গেলেন তাদের অবস্থা ঈর্ষ্যাযোগ্য ছিলো সেদিন। বাপ-মা-মরা উষার বিবাহ সেখানে হওয়ায় মামা-মামী

খুব প্রসন্নচিত্ত হতে পারেন নি; তবে তাঁদের নিজেদের অতি সাধারণ দেখতে মেয়ের বিবাহে আর বাধা রইলো না; পথের কাঁটা উৎপাটিত হতে দেখে উষার যাবার দিনে দুঃখের চেয়ে মন খুসীতে ভরে উঠেছিলো বেশী; ফলে কৃত্রিম কুমীর কান্না কাঁদতে শুকনো চোখ আগাগোড়া ধুতির খুঁটে এবং আঁচলের পাড়ে ঢেকে রাখা ছাড়া গত্যন্তর কি ছিলো আর? কিন্তু শশীকলা কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিলো। তার নিজের অস্তিত্বের একটা বড় অংশ উষাব শ্বশুর বাড়ী চলে যাবার মুহূর্তে উষাব সঙ্গেই বিদেশযাত্রা করেছিলো সেদিন।

তারপর শশীকলারও বিয়ে হয়ে গেছে একসময়ে। প্রথম প্রথম ঘন ঘন চিঠি; পরে বেশ কিছুদিন অন্তর অন্তর; তারপর একদিন দুপক্ষই নীরব হলো; একজন সংসারেব, অপরজন সামাজিক অনুষ্ঠানেব যাঁতাকলে পিষ্ট হতে হতে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হলো বটে কিন্তু বিস্মৃত হলো না। উষা চলে যাওয়ায় শশীকলার অস্তিত্বের যে অংশ তার সঙ্গে গেছে, সে আজও আর ভরাট হয়নি; একটা মস্তো বড় অপূবণীয় ফাঁক থেকে গেছে আজও। এখনও বুকের মধ্যে সেই সখীর জন্যে কন্না গুমরে গুমরে ফেরে। শুধু শশীকলা নয়; উষাও বিস্মৃত হয়নি যে তাকে তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ সশরীরে প্রেরণ করেছে সে আজ। কৃতজ্ঞতায়, আনন্দে, বেদনায় জীবনের প্রায় শূন্য পাত্র আজ কানায় কানায় ভরে দিয়েছে বেলফুল; কলকাতায় গেলে যেন প্রথম শশীকলার কাছেই যায়, বলে দিয়েছে ছেলেকে বারবার। অবশ্য মনে মনে সঙ্কোচও বোধ করেনি যে শশীকলা; এমন নয়। এই শতছিন্ন পরিবেশের হীনমন্যতায় আক্রান্ত শশীকলা ভালো করে চোখ তুলে তাকাতে পাচ্ছে না বেলফুলের রাজপুত্রের দিকে। কিন্তু স্বর্ণদেবের খেয়ালই নেই যে পরিবেশটা তার পরিধানের উপযোগী নয়। সে এমন সহজে, এমন সচ্ছন্দ হয়ে বসলো; এমন নিজের বাড়ির মতো করে

চাইলো এক কাপ চা, যে শশীকলার সঙ্কোচের কালিমা যেন তার অকৃত্রিমতার ব্লটিং এক গণ্ডুষেই শুষে নিলো সবটুকু। শশীকলা ভালো করে তাকিয়ে দেখলো এতক্ষণে।

মায়ের মুখশ্রী পেয়েছে স্বর্ণদেব; বাবার লম্বা চওড়া স্বাস্থ্য। তাছাড়া অভিজাত বংশে জন্মানোর কল্যাণে একটা সহজাত বিনয় নম্র ব্যবহারের ছাপ পড়েছে হাঁটা, লেখায়, কথাবার্তায়, হাসিতে, তাকানোয়। হাসলে তুগালে বেশ টোল পড়ে তুটো; ছোট্ট ছোট্ট টোল। যেমন পড়তো উষার কপালে। চোখ তুটোর দিকে তাকালেই মনে হয় যেন অফুরন্ত প্রাণের কৌতুক জীবনপাত্র থেকে উছলে উছলে পড়ছে বা পড়তে চাইছে কেবলই। আঁটসাট; লম্বায় যেমন চওড়ায় তেমন। গায়ের রং সাজ্ঘাতিক গৌর নয় বটে কিন্তু কম্‌প্লেকসান কোয়ায়েট প্লিসিং। চামড়া দারুণ স্নিগ্ধকান্তি। মেদের বাহুল্য নেই; কিন্তু রোগা নয় একেবারেই। হাড়গুলো চওড়া; হাঁ-মুখ খুব ছোট; ওয়েলসেট টিথ মুক্তোর মতো সারসার ঝকমক করে মুখব্যাদান করলেই স্বর্ণদেব। কম্‌প্লেকসান, বডির ফর্মেশানের সঙ্গে ম্যাচ করে এমন সুন্দর সিজন্যাল স্যুট পরেছে একখানা সে তাতেই খুলে গেছে বাহার যা এমনিতেই নিয়ে এসেছে তার চতুর্গুণ বললে অত্যুক্তি হয় অল্পই অথবা একেবারেই না।

যজ্ঞেশ্বর রায় সারাক্ষণ একটু ফিশ আউট অভ ওয়াটার মনে না করে নিজেকে পারছিলেন না। স্বর্ণদেবকে তিনি জীবনকে দেখেননি; উষার নামই শুনেছেন কেবল। সেজন্যেও নয়; সারাক্ষণ, তিনি কালকে বাড়িওলা কোর্ট থেকে পেয়াদা এনে তুলে দেবে যখন তখন কি উপায় করবেন, তারই চিন্তায় প্রি-অকিউ-পায়েড ছিলেন। স্বর্ণদেবের সঙ্গে তু একটা টুকরো কথায় যোগ দিচ্ছিলেন জোর করে। মাঝে মাঝে হাসছিলেন বটে; তবে তার সঙ্গেও ইমিনেন্ট ডেঞ্জারের অক্টোবাসে বাঁধা বিষাদক্লিষ্ট অন্তরের

যোগ ছিলো প্রায় না থাকারই মতো। বাইরে কুকুর-বেড়াল বৃষ্টির অবিরাম ধারা আরও বেশি তমসাচ্ছন্ন, হতাশাচ্ছিদত করেছিলো তার ভগ্নোত্তমকে। শশীকলা এক সময়ে চা আনতে উঠে গেল বটে; কিন্তু বহন করে নিয়ে গেল একটি দারুণ দুশ্চিন্তা; কাল বাড়িওলার কোর্টের পেয়াদা সঙ্গে করে ডিক্রি জারী করতে আসার কথা সে জানে। তার স্বামী ফট করে স্বর্ণদেবের কাছে নিজের অসহায় অবস্থার কথা জানিয়ে ধার না চেয়ে বসে,—এই আতঙ্কে ভালো করে চা করতে পারা শক্ত হয়ে উঠলো। এছাড়া আরও একটু কথা ছিলো। সেইটেই আসল কথা।

বেশ কিছুদিন আগে উষার কাছে শশীকলা চিঠিতে তার চরম দুরবস্থার কথা জানায়; যদ্যপি স্বামীর দুর্ব্যবহার এমন জায়গায় এসে পৌঁছে দিয়েছে তাকে যে এর পরের পদক্ষেপ আত্মহত্যার সুনিশ্চিত গহ্বর ছাড়া আর কোথাও করবার নেই এজগতে। কিছুদিনের জন্যে বাঁচবার মতো শেষ লড়াই করে সে একবার দেখতে চায়; তারই জন্যে প্রয়োজন বেশ কিছু অর্থের। এবং অর্থের জন্যে স্বামীর কাছে হাত পাতাও যার নিরর্থক; এক গঙ্গাজল ছাড়া তার আর কে আছে? উষার কাছ থেকে উত্তর আসেনি সে চিঠির; নিদারুণ অভিমানে অনেকদিন অপেক্ষাতেও চিঠি না আসায়, কেঁদে ভাসিয়েছিলো বিনিদ্ররাত। তারপর বিস্মৃত হয়েছিলো সেকথা বটে কিন্তু মনের মধ্যে চলতে ফিরতে বেজে ছিলো সেই কাঁটা অনেকবার। আজ হঠাৎ স্বর্ণদেব আসতে এবং উষা কলকাতায় পৌঁছেই সর্বপ্রথম শশীকলার সঙ্গে তাকে দেখা করতে বলায়,—হঠাৎ আবার সেই কাঁটাটা নতুন করে খচ করে উঠলো বুকের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার মেঘে আশার রূপালী রেখাও ঝিলিক দিলো একবার। স্বর্ণদেবের সঙ্গে টাকা পাঠাইনি তো উষা। ভয়ও হলো। স্বামী যেন জানতে না পারে টাকা পাঠালে মাথার দিব্যি দিয়ে পইপই করে সেকথা লিখেছিলো সে

শশীকলা, তা এখনও মনে আছে। কিন্তু স্বর্ণদেব ছেলেমানুষ ; যদি তুলে দেয় স্বামীর হাতে সব টাকাটা তাহলে ?

স্বর্ণদেব ছেলেমানুষ নয়। সেও বসে বসে ফন্দি আঁটছিলো ; কি করে শশীকলার হাতে যজ্ঞেশ্বরের আড়ালে টাকা এবং মায়ের চিঠি তুলে দেওয়া যায় সেই চিন্তায় ব্যাপৃত ছিলো তার মন। যজ্ঞেশ্বর এক সময়ে জিজ্ঞেস করেঃ হোটেলে কত নম্বর ঘরে উঠেছ তুমি ? স্বর্ণদেব তার ওয়ালেটটা থেকে কার্ড বার করে ঘরের নম্বরটা লিখে দেবার জন্যে খুলতেই একগোছা একশো টাকার নোট ছড়িয়ে পড়লো মেঝেয়। মেঝেয় বসে পড়ে স্বর্ণদেব যখন নোটের গোছা কুড়োতে বসেছে তখন যজ্ঞেশ্বর তার পেছনে বসেছিলো ; তাই রক্ষে। স্বর্ণদেব দেখতে পেল না মানুষের বলে প্রত্যাশায় নরখাদকের চোখে জ্বলে ওঠে যে পৈশাচিক লোভের লেলিহান অগ্নিশিখা তারই ছায়া পড়েছে যজ্ঞেশ্বরের চোখেও। যজ্ঞেশ্বর নিজেও কি তা জানতো ? তার সেই অর্থলোভাতুর দুচোখ তখন বিদ্যুৎগতিতে হেঁটে বেড়াচ্ছে ছড়িয়ে পড়া একশো টাকার নতুন ব্যাঙ্ক নোটের ওপব দিয়ে। একখানা ; দুখানা ; তিনখানা— আর গুণতে পারে না যজ্ঞেশ্বর। ঝিমঝিম করে সর্বাঙ্গ। মুখ দিয়ে গোঙানির মত শব্দ হয়। স্বর্ণদেবেব নোট কুড়োনো সবে শেষ হয়েছে ; জিজ্ঞেস করে। কি হলো ? না ; কিছু নয়। আশ্বস্ত করে যজ্ঞেশ্বর স্বর্ণদেবকে না নিজেকেই কে জানে। যজ্ঞেশ্বরের মনে পড়ে কাল সকালে বাড়িওলা আসবে কোর্টের লোক নিয়ে। সাত মাসেব ভাড়া প্লাস কষ্ট মিলে প্রায় চারশোটাকা চাই-ই ; আরও একটা কথাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়লো।

আরও একটি সে চিন্তাসূত্র জট পাকাচ্ছিলো উত্তপ্ত মাথায় আস্তে আস্তে তা হচ্ছে কতগুলো ফটো ডেভলাপ এবং প্রিন্টিং ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ওষুধের শিশির গায়ে লেবেলমারা তীব্র বিষ কথাটা। ছেলেমেয়েদের একটি নেশা যজ্ঞেশ্বর এই দুর্দিনেও ছাড়তে দেয়নি।

ফটো তোলার জন্যে অকাতরে অর্থ ব্যয় করেছে সে; নিজের নেশার জন্যে যেমন তাদের নেশার জন্যেও তেমনই কখনও হাতের মুঠি আলগা করতে দ্বিধাগ্রস্থ হয়েছে কদাচ। ছেলেমেয়ে ছবি তুলতো; যজ্ঞেশ্বর ডেভেলপ এবং প্রিন্টিং কার্য সমাধা করতো বাড়িতেই ডার্কচেম্বারে; দোকানে যেত না। ছেলেমেয়েকেও শেখাচ্ছিলো আস্তে আস্তে কেমন করে ভালো ডেভেলপিং এবং ভালো প্রিন্টিং-এর ওপব নির্ভব করে ছবির আরও ভালো। সেই ডার্ক চেম্বারের অন্ধকাবে সাজানো কয়েকটি শিশির গায়ে লেবেল লাগানো আছে; তীব্র বিষ, সেগুলো এখন যজ্ঞেশ্বরের মনের চোখে জ্বল জ্বল করতে লাগলো, মনুষ্যবক্তের স্বপ্নে, চিড়িয়াখানায় রাজবন্দী বযাল-বেঙ্গলের কপিষ চোখে কখনও কখনও ছায়া পড়ে যেমন জঙ্গলেব। স্বর্ণদেবেব চোখে চোখ বেখে কথা বলতে সাহস হচ্ছিলো না তার; যদি চোখ কথা বলে বসে। ঠিক সেই অসময়ে শশীকলা ঢুকলো গরম চায়ের কাপ হাতে করে; বাঁচিয়ে দিলো স্বর্ণদেবকে একটি হত্যাব ষড়যন্ত্র থেকে এবং যজ্ঞেশ্বরকেও; যজ্ঞেশ্বরকেও একটি অবস্থাব চাপে পড়ে বাধ্য-হত্যার দায় থেকে। দুটি কাজেই অবশ্য শশীকলা না জেনেই করলো; নিজের অজান্তে নয় কেবল, স্বর্ণদেবেবও। স্বর্ণদেব মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলো আব দিলো শশীকলাকে। সময়মতো চায়ের কাপ হাতে করে না ঢুকলে যজ্ঞেশ্ববেব হাতে স্বর্ণদেবের যা হতো তা হবার আর সম্ভাবনা রইলো না; চা খাবার পবই স্বর্ণদেব চলে যাবে; আর বসবে না। বসতে দেওয়া আর উচিত হবে না তাকে।

চা খেতে খেতেই মূষলধারে বৃষ্টি নামলো আবার; এতক্ষণ যেরকম লয়ে হচ্ছিলো তার চেয়ে চতুর্গুণ একসিলারেশানে। এবং চা খাবার পর এতটুকু শিথিল করলো না বর্ষণ তার পতনের দুর্বার গতি। প্রথম প্রথম একটি দুটি আলগা কথা হচ্ছিলো; শশীকলা জিজ্ঞেস করছিলো স্বর্ণদেব আবার কবে আসছে; স্বর্ণদেব

হাসতে হাসতে জবাব দিয়েছিলো তার, আজ যদি হোটেলে ফিরতে পারে সে তবেই তো উঠছে সেকথা। স্বর্ণদেব বৃষ্টির কথা মনে করেই অবশ্য এউক্তি করেছিলো; যজ্ঞেশ্বর কিন্তু চমকে উঠেছিলো তৎক্ষণাৎ; বলে কি স্বর্ণদেব। তারপর অবশ্য আশ্বস্ত করে স্বর্ণদেব; দু'একদিনের মধ্যেই সে আবার আসছে! তার দরকারও আছে না কি শশীকলার কাছে। দরকার আছে, শুনেই শশীকলা চট করে অন্য কথা পেড়ে ঢাকা দেয় স্বর্ণদেব যাতে আরও কিছু বলে না ফেলে। শশীকলা বলে, আজ প্রথম দিন তাদের বাড়িতে পা দিয়েই যে দুর্যোগের মধ্যে পড়ে গেছে স্বর্ণদেব, আর এপথ মাড়ালে হয়। স্বর্ণদেবও সঙ্গে সঙ্গে প্রায় একই সুরে প্রকাশ করে উদ্বিগ্নতা; বাস্তবিক কি কুক্ষণেই না সে আজ বেরিয়েছিলো হোটেল থেকে যজ্ঞেশ্বরের ঠিকানায়। আজ না এসে কাল এলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হতো সে কথা এখন ভেবে আর লাভ কি, একথা ভেবেও, না ভেবে পারে না সে যেকথা, তা হচ্ছে ওই। কিন্তু কথাটা স্বর্ণদেবের মুখ থেকে বেরুনো মাত্তর যজ্ঞেশ্বরের মনে হলো তা স্বর্ণদেবের মুখ থেকে নয়, তা নির্গত হয়ে রিভলভারের নীরব সোজা ওষ্ঠ থেকে চলে গেছে বুঝি যজ্ঞেশ্বরের বক্ষপঞ্জর ভেদ করে।

এক সময়ে বৃষ্টি ধরবার যখন আর নাম নেই, তখন যজ্ঞেশ্বর বলে শশীকলাকে শুতে যেতে। বৃষ্টি থামলে স্বর্ণদেবকে ট্যাক্সিতে তুলে দেবে যজ্ঞেশ্বর। স্বর্ণদেবও নিদারুণ অস্বস্তি বোধ করছিলে; সে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো শশীকলাকে; আপনি যান। আর দেরী করবেন না; আমি ঠিক চলে যেতে পারব বৃষ্টি থামলেই। যজ্ঞেশ্বর যোগ দেয় বিরতিহীন কথার রেখা টেনে; না যেতে পারলেই বা কি? স্বর্ণদেব তো আর জলে পড়ে নেই। স্বর্ণদেব এবং যজ্ঞেশ্বর দুজনেরই যুগপৎ উপরোধে শশীকলা শেষ পর্যন্ত ঢোঁক গিলতে বাধ্য হ'লো এক সময়ে। দুতলায় শুতে যাবার আগে অবশ্য পই পই করে বলে গেল স্বর্ণদেবকে যেন জল না

থামলে এখানেই রেখে দেয় যজ্ঞেশ্বর। এই বাড়িতে শুতে অবশ্য স্বর্ণদেবের কষ্ট হবে; তাহোক। এই জল ভেঙ্গে এত রাতে হোটেলের পৌঁছনর দুঃসহ কষ্ট থেকে তা কম হবে অন্তত। স্বর্ণদেব শুনে হাসে: আমরা যদি খুব গরীব হতাম তাহলে আপনারা সিঙ্গাপুরে গেলে কোনওদিন এবং এইভাবে আটকে গেলে কি মা আপনাদের হোটেলে যেতে দিতেন? শশীকলাও হেসেই বলে: মায়ের ওপর সে জোর চলে; কিন্তু—। 'এর মধ্যে কোনও কিন্তু নেই, আমি তো সেই মায়েরই ছেলে,—স্বর্ণদেবের উত্তরে চিবুক ধরে আদর করে শশীকলা: তুমি কেবল বেলফুলের কেন বাবা,—তুমি আমারও ছেলে যে।

শশীকলা চলে যায় ওপরে; কিন্তু বৃষ্টি যায় না আর। এক সময়ে যজ্ঞেশ্বর বলে: চা খাও আরেক কাপ। স্বর্ণদেব জিজ্ঞেস করে: আপনি ভাত খাবেন না? যজ্ঞেশ্বব: না; শরীরটা জুতের লাগছে না। এক কাপ চা খাবো, ওই সঙ্গে তুমিও খাও। বৃষ্টির তোড় একটু কমলো বোধ হয়; চা আনতে আনতে থেমে যাবে। যজ্ঞেশ্বরকে তখন বাধা দেবার চেষ্টা করে স্বর্ণদেব কিন্তু পারে না। যজ্ঞেশ্বব জানায় যে চা করতে কিছুই হাঙ্গামা নেই; স্টোভে চা জল গরম হতে পাঁচ মিনিট; তাছাড়া তার নিজের জন্যে হাঙ্গামা তো করতেই হবে। এককাপ চায়ের বদলে দুকাপ তৈরী করতে তো আর ডবল হ্যাঙ্গামা বা দ্বিগুণ সময় লাগবে না। স্বর্ণদেব চুপ করে যায়। চা কবতে গিয়ে ভগবানকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলো যজ্ঞেশ্বর; আর দিলো বৃষ্টিকে। আরেকটা সুযোগ এসে গেছে হাতের মুঠোয়। ডার্করুমের ডেডলি পয়সন 'লেখা লেবেলের লাল চেহাবা ভেসে এলো। বাড়িওলার ডিক্রির লাল চেহারাও। আর ভেসে উঠলো স্বর্ণদেবের ওয়ালেট থেকে মেঝেয় ছড়িয়ে পড়া একশো টাকার একগাদা নোট; চৈত্রদিনে বৃক্ষচ্যুত ঝরাপাতার দল।

চা তৈরী করে ডার্কচেম্বারে ঢুকে দেশলাই জ্বাললো স্বর্ণদেব। হাত কাঁপছে; প্রথম কাঠিটা জ্বলেই নিভে গেলো। দ্বিতীয়টাও। বার বার তিনবার। তৃতীয়টা লেলিহান হলো অন্ধকারে; ডেডলি পয়সন থেকে খানিকটা চলে গেল চায়ের কাপে। এঘরে আসতেই দেখলো অধীর উত্তেজনায় স্বর্ণদেব পায়চারী করছে। স্বর্ণদেব : বৃষ্টি ধরে গেছে, আবার নামতে পারে; আর দেরী নয়। ট্যাক্সি পাব তো? যজ্ঞেশ্বর বলে : নিশ্চয় পাবো; এটা কলকাতা শহর; চা টা খেয়ে নাও—। স্বর্ণদেব হঠাৎ লক্ষ্য করে যজ্ঞেশ্বরের হাতে কাপ নেই। 'আপনার চা;—স্বর্ণদেবের প্রশ্নে শক খায় যজ্ঞেশ্বর : ওই যাঃ,—আমারটা ওপরেই রেখে এসেছি; নিয়ে আসি।

নিয়ে আসবার জন্যে পা বাড়াবার আগেই স্বর্ণদেব বলে : চায়ে একটা ওষুধের মতো গন্ধ কিসের বলুন তো? যজ্ঞেশ্বর : ভালো না লাগে খেও না বাবা জোর করে; তোমাদের দামী চা খাবার অভ্যেস তো? নিদারুণ লজ্জা পায় স্বর্ণদেব : ছিঃ ছিঃ কি যে বলেন? সেজন্য নয়,—সত্যি একটা পিক্যুলার গন্ধ পাচ্ছি। আপনি কিছু মনে করবেন না কিন্তু—।

স্বর্ণদেবের জীবনের সেই হচ্ছে শেষ কথা।

জামাগায়ে না দিয়ে ওপরে না গিয়ে ঘরের বাইরে অপেক্ষা করে ফিরে আসেন যখন যজ্ঞেশ্বর দড়াম করে দারুণ আওয়াজ করে পড়ে যায় স্বর্ণদেব মাটিতে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিল স্বর্ণদেব।

স্বর্ণদেবের পাশে উবু হয়ে বসে বুক পকেট থেকে ওয়ালেটটা প্রায় ছিঁড়ে বার করে নিয়ে এলো যজ্ঞেশ্বর। একশো টাকার দিস্তের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো মুখবন্ধ খাম। সেটা ছিঁড়ে নিয়ে খুলতে বেরিয়ে পড়লো শশীকলার নামে একটা চিঠি :

প্রাণের 'গঙ্গাজল',

তোমার পত্র অনেকদিন হলো পাইয়াছি। উত্তর দিই নাই,- তার জন্য মনে দুঃখ করিওনা। কিছুটা আলস্য, কিছুটা সংসারের ঝামেলা ছাড়াও আরও একটি কারণ এই পত্র যখন তোমার হাতে পড়িবে তখন আশাকরি তোমারও উপলব্ধি করিতে দেরী হইবে না। স্বর্ণ অনেক দিন হইতেই কলিকাতা যাইবে যাইবে করিতে-ছিলো; তাহার হাত দিয়াই তোমার প্রয়োজন উদ্ধার করিব মনস্থ করায়, পত্র দিই নাই। মণিঅর্ডার করিলে জানাজানি হইবার এবং সেভয় আছে বলিয়া জানাইয়াছ তাহাই ঘটিবার সবিশেষ আশঙ্কাহেতু ছেলের হাতদিয়া পাঠাইলাম; দেরী হইলেও আশা করি ইহা তোমার কাজে লাগিবে। আর একটি কথা; স্বর্ণ প্রথমে হোটেলে গিয়ে উঠবে। কারণ কলকাতায় গিয়েই তোমার বাড়ী যেতে পারিবে ঠিকানা খুঁজে, মনে হয় না। কিন্তু হোটেলে দুএকদিন থাকিলেই সে যাইবে তোমার বাড়িতে এবং বাকী ক'দিন সেখানেই থাকিবে; কর্তাকে বলিও কলকাতার দ্রষ্টব্য সব দেখাইতে। আমি জানি যে তোমার কস্টের সংসার। তবুও স্বর্ণ কলকাতায় গিয়া যদি হোটেলে উঠে, তোমার ওখানে না যায় তাহাতে তুমি অনেক বেশী কষ্ট পাইবে। স্বর্ণরসঙ্গে কথা বলিলে বুঝিবে তাহাকে আলালের ঘরের দুলাল করিয়া মোটেই মানুষ করি নাই; কষ্টসহিষ্ণু করিয়াছি। তাহা ছাড়া স্বর্ণ জানে সে যতখানি আমার ততখানিই তোমার।

পত্রে তোমার দুর্ভাগ্যের বিষয় সবিশেষ অবগত হইলাম। ভগবানের কাছে একান্তভাবে প্রার্থনা করি যে তোমার সংসারে দুঃখের ধারার অবিলম্বে সমাপ্তি ঘটুক এবং লক্ষ্মীশ্রী ফিরিয়া আসুক। স্বর্ণর মুখে এখানকার সব খবর পাইবে। তুমি পত্রের উত্তর দিও যথাসম্ভব শীঘ্রই। আমি দেরীতে দিয়াছি বলিয়া

তোমাকেও দেরীতে দিতে হইবে অথবা একেবারে স্বর্ণর ফিরিবার সময়ে তাহার হাতে দিতে হইবে,—এমন মাথার দিব্য কেহই দেয় নাই।

আমার ভালোবাসা লইও; বাচ্চাদের স্নেহচুম্বন দিও।

তোমার

বেলফুল।

চিঠিশেষ করবার পর কতক্ষণ যজ্ঞেশ্বর চুপ করে বসে রইল।

শশীকলার ঘুম ভাঙ্গতেই প্রথম যার কথা মনে পড়লো সে হচ্ছে বাড়িওলা। যজ্ঞেশ্বর শশীকলার হাতে স্বর্ণর মায়ের চিঠি এবং টাকা তুলে দিলো। শশীকলা তখনও চোখে-মুখে জল দেয়নি। টাকাটা পুরো পেয়ে সে একটু অবাকই হলো। বেলফুলের প্রার্থনা ফলতে সুরু করলো নাকি। একটু বাদেই দরজার কড়া সজোরে নড়ে উঠতেই বোঝা গেল আদালত থেকে পেয়াদা সমেত ডিক্রি জারী করতে এসেছে। দরজা খুলে দেখলো,-না। একজন মাত্র লোক; বাড়িওলার চিঠি নিয়ে এসেছে। চিঠিতে বাড়িওলা জানাচ্ছে যে বাড়িওলার স্ত্রী চাননা যে ব্রাহ্মণকে বাড়ি থেকে তুলে দেওয়া হোক কোর্টের পেয়াদা দিয়ে। তাই আরও একমাস সময় দিচ্ছেন তারা। ভাড়া না দিতে পারলেও যেন বাড়িটা অন্ততঃ ছেড়ে দেন যজ্ঞেশ্বর; তাতেও বিশেষ অনুগ্রহ করা হবে বাড়িওলাকে। পড়ে ভাড়া দেওয়া না দেওয়া যজ্ঞেশ্বরের বিবেকের ওপর ভরসা করেই তাঁরা ছেড়ে দিচ্ছেন।

শশীকলা চিঠিটা পড়ে বললো: শেষ পর্যন্ত ঠাকুর বাঁচাবেন, জানতাম। ধক করে ওঠা বুক চেপেধরে যজ্ঞেশ্বর বলে নিজের মনেই: বড্ড দেরী হয়ে গেল যে—

শশীকলা জিজ্ঞেস করে: কি বলছ? ততক্ষণে সামলেনিয়ে যজ্ঞেশ্বর উত্তর দেয়: না। বলছি, অফিসের বড্ড দেরী হয়ে গেল যে—।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এক

হোটেল থেকে খবর গেলো পুলিশেঃ স্বর্ণদেব হোটেলে ফেরেনি। পুলিশ থেকে স্বর্ণদেবের বাড়ি সুদূর সিঙ্গাপুরে। হৈ চৈ পড়ে গেল কলকাতা সহর জুড়ে। স্বর্ণদেবের বাবার প্রভূত অর্থ বঙ্গদেশের টনক নড়িয়ে দিলো। সরকারের সর্বোচ্চ মাথা অর্থাৎ গভর্ণব পর্যন্ত লালবাজারের কর্তার ওপব চাপ দিলেন যেমন করে হোক খবর চাই। কিন্তু খবব চাই বললে রহস্য গল্পের লেখকরা মুহূর্তে খবর আনতে পাবেন। কিন্তু এ তো গোয়েন্দা কাহিনী নয়; যে খবব চাই বললেই উত্তেজক বোমাঞ্চকর ভয়াবহ খবর নিজের পায়ে হেঁটে এসে ডিটেকটিভকেই বলে যাবে কেবল যে পুলিশ যেপথ দিয়ে এগুচ্ছে, তুমি এগোও তার উল্টো রাস্তা ধরে যাতে রহস্যোদ্ধারের সঠিক উপায় একমাত্র তোমারই হাতের মুঠোয় এসে যাবে। এই হত্যাকাণ্ডেব কোনও কিনারা শেষ পর্যন্ত পুলিশ করতে ব্যর্থ হয়েছিলো। ডিটেকটিভ স্টোরিতে পারি মাসন অথবা তার সমগোত্রীয়দের আগে থেকেই এস্যুয়ার্ড সাকসেসের চেয়ে কিন্তু এই ব্যর্থতার ইতিহাসও অনেক বেশি রোমাঞ্চকর। কারণ স্বর্ণদেবের হত্যাকাণ্ড বানানো ক্রাইমথ্রিলারের অঙ্গ নয়; রিয়্যাল-লাইফ মার্ডার। তা-ই। স্বর্ণদেবের বাবা স্কটল্যাণ্ড ইয়াড থেকে বিশেষ পারদর্শী কাকুকে আনতেও প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু লাল-বাজারের এক নম্বর সেপাই মিস্টার হ্যারিস সেদিন তাতে রাজি হননি; তিনি বলেছিলেন যে কলকাতার দুটি প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর মধ্যেই সব চেয়ে সুদক্ষতার পরিচয়বাহী। এই দুটির একটি হচ্ছেঃ ক্যালকাটা ট্রামওয়েস; আরেকটি ক্যালকাটা পোলিস।

সাহেবদের আমলের কলকাতা পুলিসের কথা বলছি; মোসাহেবদের আমলে আজ তার যে হাল হয়েছে সে দেখে কেউ যেন সেদিনকার লালবাজারকে জাজ করবার অসম্ভব প্রচেষ্টা করবেন না। আজকের কলকাতায় লিটারেট কন্‌স্‌টেবল গরুর সিং ধরে সরিয়ে দেয় রাস্তা থেকে; কারণ রাস্তার ওপর সি-পি-র নির্দেশ অমান্য করা শক্ত: No Horn Area। আজকের কলকাতায় গৃহস্থের বাড়িতে চুরি হলে থানার বড়বাবু বলেন: চোরটাকে নিয়ে আসতে পারেন যদি একবার তাহলে ঠেঙ্গিয়ে বার করে দিতে পারি আপনার মাল। এ কলকাতার কথা যেমন না বলে সে-কলকাতার কথাই এতক্ষণ বলছি তেমনই হ্যারিসের যে মন্তব্য ওপরে তুলে দিয়েছি তা-ও এ কলকাতার পুলিশের ব্যাপারে নয়; সে কলকাতার ক্যালকাটা পোলিশের সম্পর্কেই অবধারিত বর্ষিত।

প্রিলিমিনারি কাজ খুব দ্রুত এগুলো ইন্‌স্‌পেক্টর রবীন্‌সের নেতৃত্বে। যে ট্যাক্সি করে স্বর্ণদেব হোটেল থেকে পুরোনো ঠিকানা হয়ে যজ্ঞেশ্বর রায়ের তদানীন্তন কারেন্ট এড্রেসে উপস্থিত হয় সে ট্যাক্সির চালক এসে এজাহার দেয় তো বটেই; একস্যাক্‌ট্‌লি কোন স্পটে ছেড়ে দেয় কুকুর-বেড়াল বৃষ্টির মধ্যে তা-ও নিজে পুলিশকে সঙ্গে করে দেখিয়ে দেয়। অবশ্য ট্যাক্সি-চালকের স্বীকৃতির সাঙ্ঘাতিক কোনও গুরুত্ব এই তদন্তকার্যের প্রাথমিক স্তরে দেবার দরকার ছিলো না আরক্ষ-অফিসারের; কারণ যজ্ঞেশ্বর রায় একবারও অস্বীকার করে না যে স্বর্ণদেব তার বাড়ি গিয়েছিল সেরাতে। ডিটেল্‌ড্‌ ডেসক্রিপশন দেয় স্বর্ণদেব সেখানে কি অবস্থায় যায়; কতক্ষণ বসে; কি বলে; কি খায়; এবং লাস্ট বাট নট দি লিস্ট কখন তাকে স্বর্ণদেব আবার রাতে বৃষ্টি ধরলে কোথা থেকে ট্যাক্সীতে তুলে দেয়। অনেকখানি হাঙ্গামাই অবশ্য মিটে যেত যদি এই লাস্ট ট্যাক্সির ড্রাইভার প্রথম গাড়ির

চালকের মতো এসে জানাতো সে বার্তা। কিন্তু স্বর্ণদেবকে যে এনজে্ড্ ট্যাক্সিতে যজ্ঞেশ্বর তুলে দেয় সে ট্যাক্সির হদিস কিছুতেই করা গেল না।

সন্দেহ ঘনীভূত এবং লিমিটেড হলো তুজনের ওপর। এক যে ট্যাক্সিতে করে স্বর্ণদেব ফিরে যেতে যায় গ্রাণ্ডে সেই ট্যাক্সির চালক পয়সাকড়ির লোভে স্বর্ণদেবকে মেরে ফেলতে অথবা সরিয়ে ফেলতে পারে; তুই,—যজ্ঞেশ্বর তাকে অনুরূপ কিছু করে থাকতে পারে। কিন্তু যজ্ঞেশ্বরেব ফেভারে সব চেয়ে বড় কথা ওই চিঠি এবং টাকা,—স্বর্ণদেবের মায়ের। অর্থাৎ যজ্ঞেশ্বরের কোনও কারণ নেই স্বর্ণদেবের কোন রকম ক্ষতি করায়। যজ্ঞেশ্বরের ওপর থেকে সন্দেহের রঞ্জনরশ্মি সরিয়ে নিয়ে নিরুদ্দিষ্ট ট্যাক্সি চালকের ওপরই কল্পনায় বেশি নিবদ্ধ করা হলো পুলিশের মতে অনেক লজিক্যাল। পুলিশে সেই সময়ে সব চেয়ে বিচক্ষণ সব চেয়ে সাহসী এবং দক্ষ পদাধিকারী যিনি ছিলেন তুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি কালা আদমী; তাই তাঁকে ডিঙিয়ে অনেক অপদার্থ এ্যাংলো এবং খাস ইংবেজকে ডেপুটি করা হলেও তাঁকে এ্যাসিট্যান্ট কমিশনার করা হচ্ছিলো না কিছুতেই। ভদ্রলোকের নাম: হরিপদ দাশশর্ম্মা। হরিবাবু বললে বাঘে গরুতে, চোর পুলিশে এক ঘাটের জল, এক হাজতের ভাত খেত সেদিন,—এমন দাপট ছিলো তাঁর সে কলকাতায়। হ্যারিস এই হরিবাবুকে অসম্ভব ভালোবসত। এ্যাংলো এবং স্বজাতি-চক্রে কিছুতেই হরিবাবুকে তাঁর প্রাপ্য পদ দিতে পারছিলেন না। এখন বললেন যে স্বর্ণদেব-রহস্যের কিনারা করতে পারলে কোনও চক্র অথবা চক্রান্তই আর ডেপুটি কমিশনারশিপ ঠেকাতে পারবে না কিছুতেই। হরিবাবু বললেন হ্যারিসকে: সাহেব এযুগে হেডে কিছু নেই; ফোরহেডেই সব। কাজেই কুষ্টি জুতের নাহলে ডেপুটি কেন কন্স্টেবলের ওপরে ওঠাই শক্ত; হেডে কিছু হলে আমার হোতো; ফোরহেডেই যখন সব হচ্ছে

তখন কপাল না খেলা পর্যন্ত আমার নামই হচ্ছে কেবল। তা,—ডেপুটিগিরির জন্যে নয়,—কলকাতার ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত এরকম কেস আসেনি এবং আবার কবে আসবে; আদৌ আসবে কি না বলা শক্ত। টু বি ভেরি ফ্রাঙ্ক স্যার পৃথিবীর খুনের মামলাতেই পুলিশের পক্ষে আসামীকে স্পট করার এমন সুদূর পরাহত বললে কিছুই বলা হয় না, নাই ইমপসিবল এমন কেস কখনও এসেছে বলে আমার জানা নেই; এই তদন্তর ভাব আমার ওপর যদি ন্যস্ত করেন তাহলেই আমাকে যে সম্মান প্রদর্শন কর্বেন তা ডেপুটি কমিশনারীর চেয়ে কোটিগুণ গৌরবের; কেবল জীবনের শেষ সন্ধ্যায় পৌঁছে এই কাজ নিয়ে সে গৌরব রাখতে পারব কি না এই দোলায় বারবার আমাকে বিচলিত করছে; কাজে হাতে দেবার আগেই পারা-না-পারার এমন দ্বন্দ্বে আগে কখনও এমন করে দুলিনি।

ক্যালকাটা পোলিসের তদানীন্তন টনক আইরিশ উইট যার রক্তে সেই হ্যারিস পর্যন্ত গম্ভীরবদন হয়ঃ বলো কি হরিবাবু? আ'য়ু কিডিং? কলকাতা পুলিশের অক্সিজেন হরিপদ দাশশর্মা রিটর্ট করেনঃ কিডিং মিসেলফ্? হোয়াই সুডাই অন আর্থ। হ্যারিস ভুরু কুঁচকোয় দেন? হরিপদ দাশ শর্মা ইচ্ছে করলেই চোখ ট্যারাতে পারতেন; কেউ ভুরু কুঁচকোলেই তাঁর চোখ ট্যারাতো। চোখ ট্যারা দেখলেই হ্যারিস বলতো; হরিবাবু ইয়োর আইবল ইস বিট্রেয়িং য়ু; মাইণ্ড ইট প্লিস! হ্যারিস যেমন বাঘাওল, হরিপদ দাশশর্মা তেমনই বুনো তেঁতুল। এক মুহূর্ত দেরী না করেই আসে তাঁর রিজয়ণ্ডারঃ ইয়োর আইব্রো স্যার। হ্যারিস 'সরি' বলে আবার নর্ম্যাল হন; মুহূর্তের মধ্যে হরিবাবুর ট্যারা চোখ আবার লেভেল হয়। হরিবাবু বলেন এবারেঃ ইয়েস স্যার, দিস ইস ওয়ান অফ স্ট্রেকার ছান স্থিকসন রিয়্যাল ক্রাইমস্, ছাট এনি পুলিশ অফিসার উড টেক প্রাইড ইন প্রোবিং—! হ্যারিস তখনও

বিহিতার্থ উপলব্ধি করতে না পেরে হরিবাবুর ওপর অর্ডার করেন: বি প্রিসাইসফ গডস্ সেক হরিবাবু। হরিবাবু ব্যাখ্যা করতে বসেন।

হরিবাবুর রিডিং সংক্ষেপে এই। স্বর্ণদেব কলকাতায় আসে মাত্তর সেইদিন; তাকে কেউ চেনে না এখানে,—এবং সে-ও কাউকে চেনেনা। যজ্ঞেশ্বরের তাকে যদি হত্যা অথবা গুমও করে থাকে তাহলেও তাকে ধরা শক্ত যতক্ষণ স্বর্ণদেবের জীবিত অথবা মৃতদেহ না পাওয়া যায়। যে ট্যাক্সিতে স্বর্ণদেবকে তুলে দিয়েছে বলে যজ্ঞেশ্বর ক্লেম করছে সে ট্যাক্সিওলার হদিস এখনও পর্যন্ত করা যায় নি। সে নিজে থেকে ধরা দিলে অথবা কেউ তাকে ধরিয়ে না দিলে পুলিশের বাবারও ক্ষমতা নেই তাকে খুজে বার করে। যজ্ঞেশ্বর তার নম্বর দিতে পারে নি; চেহারার যা বর্ণনা দিয়েছে তাতে যে কোনও ড্রাইভারের চেহারাতেই তার আনসার আছে। যজ্ঞেশ্বর নিজে যে চিঠি প্রোডিউস করেছে পুলিশের কাছে, স্বর্ণদেবের মায়ের চিঠি শশীকলার কাছে, তাতে টাকার জন্যে স্বর্ণদেবকে হত্যা অথবা গুম করা বাতুল না হলে যজ্ঞেশ্বরের পক্ষে করা অসম্ভব। এবং যজ্ঞেশ্বর খুনী, চোর, জোচ্চর, মাতাল যা খুসি তাই হতে পারে; কিন্তু তার পরম শত্তুরও তাকে উন্মাদরোগগ্রস্থ বলবে না কিছুতেই; বললেও তা আইনে টিকবে না এক ধোপও। তাহলে?

পাইপে টোব্যাকো ঠাসতে ঠাসতে হ্যারিস ভুরু আবার কুঁচকোতে কুঁচকোতে সামলে নেন: আই সি। চোখ ট্যারাতে ট্যারাতে হরিপদ দাশশর্মা সামলান লাস্ট মোমেন্টে: বাট আই ক্যাণ্ট সি দি ওয়ে আউট সার এস ইয়েট—

হ্যারিস: তাহলে কোন অনুমান কিছু করেছ নিশ্চয়ই—

হরি: তা করেছি—

হ্যা: কি অনুমান তোমার?

হরি : যে কোনও হত্যা অথবা গুমের কেসে দুটো জিনিষ থাকে তলায়—

হ্যা : ইদার উত্তম্যান অ' মানি—

হ : ইয়েস সা—

হ্যা : অনুমানের কোনও ভিত্তিও নিশ্চয়ই—

হ : হ্যাঁ ; তা-ও জোগাড় করেছি—Its here Sir—

পকেট থেকে হরিপদ দাশশর্মা একটি ছবি বার করেন। অপূর্ব সুন্দরী এক তরুনীর। ছবিটা হাতে নিয়ে নিরীক্ষণ করতে থাকেন হ্যারিস আর কমেণ্টারী করতে থাকেন সঙ্গে সঙ্গে হবিপদ দাশশর্মা : মেয়েটির নাম চামেলী বড়ুয়া ; ধাম—সিঙ্গাপুর। বয়স : বাইশ থেকে চব্বিশের মধ্যে। বাবা বেঁচে আছে কি নেই বলা যাচ্ছে না। মা আছে। মায়ের সঙ্গে যাদের বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ তারা সমাজের সন্দেহজনক জীব। একটি কাপ্তান আছে তার নাম সুন্দরলাল আগারওয়াল। এই ছিলো চামেলীর সঙ্গে স্বর্ণদেবের অন্তরঙ্গতার পথে সবচেয়ে স্টামব্লিং ব্লক—

হ্যা : হরিবাবু, গো এহেড—

হরিবাবু যার ছবি দেখায় সাহেবকে সে ছবি পাওয়া যায় স্বর্ণদেবের স্যুটকেশ থেকে হোটেলে। হরিবাবু ছবিটি পেয়েই দেরী না করে সিঙ্গাপুর পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ কবে সমস্ত খবর বার করে। এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যজ্ঞেশ্বর অথবা ট্যাক্সি ড্রাইভার কেউ নয় ; আসল রহস্যের সূত্র সিঙ্গাপুর থেকে লাটাইমারফৎ এসে উদয় হয়েছে কলকাতায়। এ অনুমান তিনি প্রথম দিন থেকেই করছিলেন। চামেলী বড়ুয়ার ছবি তারই সহায়তা করায় তিনি সাহস এবং উদ্দীপনা পেলেন অনেকখানি।

হরিবাবু উঠছিলেন। এমন সময় সেপাই এসে কার্ড দিলো হ্যারিসকে। হ্যারিস কার্ডখানী হরিবাবুকে এগিয়ে দিয়ে বলেন, হু ইস দিস জেণ্টলম্যান— ?

হরিবাবু কার্ড হাতে নিয়ে দেখলেন লেখা আছে : জগৎলাল কথাটা কালিতে লেখা।

হরিবাবু : কে বুঝলাম না।

একটুবাদে হ্যারিসের নির্দেশে আগন্তুক নিজেই এসে নিজের পরিচয় উদঘাটিত করে : আমাকে দেখে অবাক হয়ে নিশ্চয় ভাবছেন ; আমি কে ; আমি হচ্ছি সেই ব্যক্তি যাকে আপনি এমুহূর্তে সব চেয়ে বেশি খুঁজছেন, আমার নাম কার্ডেই দেখেছেন : জগৎলাল। আমি হচ্ছি চামেলীর বাবা—

দুই

পুলিসের হেডকোয়াটার্সে যেমন হৈ হৈ পড়ে গিয়েছিলো স্বর্ণদেবকে নিয়ে ; তার চেয়ে অনেক বেশি মেলোড্রামা অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো যজ্ঞেশ্বর রায়েব বাড়িতে। স্বর্ণর মা উষা এবং শশীকলার দুজনের দুজনকে জড়িয়ে সে কি কান্না। এতদিন বাদে এই প্রথম দেখা ; এমন হৃদয় বিদারক ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে। শশীকলা ভয়ে, লজ্জায়, সঙ্কোচে এতটুকু হয়ে গেছে নিজেকে দায়ী করে সম্পুর্ণ ; যদি সে মরতে না লেখে চিঠি, তবে আজ কটা টাকার জন্যে স্বর্ণদেব কোথায়, এপ্রশ্নে মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়তো কি এমন করে তার। অবশ্য ওই হাজার টাকা ক'টা টাকাও নয় শশীকলার পক্ষে এবং তার প্রয়োজনও ছিলো দুর্দান্ত। তবু উষার টাকা ছাড়াও কি চলে যেত না শেষ পর্যন্ত ? যেত। হয়ত এবাড়ি ছেড়ে দিতে হতো ভাড়া দিতে না পারার জন্যে ; তাহোক। স্বর্ণদেবের অন্তধান রহস্যের সঙ্গে সম্পর্ক থাকতো না তবুও। হাজার টাকার সুখের চেয়ে স্বর্ণদেবের নিরুদ্দেশের সঙ্গে নিজেদের না জড়ানোর স্বস্তি ছিলো অনেক ভালো।

স্বর্ণদেবের মা অবশ্য একটি অনুযোগই কেবল করেছেন। শশীকলার অত রাতে অমন জলঝড়ের মধ্যে স্বর্ণকে সম্পূর্ণ অপরিচিত কলকাতা শহরে ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি। তবে স্বর্ণদেবকে কেউ আটকে রেখেছে কোনও কারণে, এই পর্যন্তই ভাবতে পেরেছে নীলাব্জসুন্দরী যার ডাক নাম উষা যে শশীকলার 'বেলফুল'। স্বর্ণদেবের বাবা অবশ্য মনে মনে বুঝেছেন যে যা হবার তা হ'য়ে গেছে; স্বর্ণদেব আর কোনদিনও ফিরে আসবে না। কিন্তু স্বর্ণদেবকে হত্যা করে কার লাভ? যজ্ঞেশ্বরকে দেখে এবং তার অবস্থা শুনে পয়সার জন্যে যজ্ঞেশ্বরের কাউকে খুন করা বিচিত্র নয় বুঝেছেন; কিন্তু স্বর্ণদেবের কাছে টাকা পাবার পর যজ্ঞেশ্বর কেন ক্ষতি করবে তার? ট্যাক্সিওলা,—যে স্বর্ণদেবকে রাতে হোটেলে পৌঁছে দিয়েছে, সন্দেহ তার ওপরেই গিয়ে পড়ে অতঃপর অনিবার্য ভাবেই। কিন্তু সে-ও স্বর্ণদেবের কাছ থেকে পার্স, ঘড়ি, আংটি, বোতাম কেড়ে নিয়ে রাস্তায় নামিয়ে দিতে পারত সচ্ছন্দে। স্বর্ণর ট্যাক্সির নম্বর নেওয়া বন্ধ করবার জন্যে তাকে হত্যা করবার মতো হটকারিতায় সে যাবে কেন?

যজ্ঞেশ্বর রায় কেবল বোবা মেরে গেছে। বাড়িওলা তাকে চিঠিটা যদি একদিন আগে লেখে যে স্ত্রীর ইচ্ছে নয় তার ব্রাহ্মণ ভাড়াটেকে এভাবে অপমান করে বাড়ি থেকে তুলে দেওয়া, অতএব আরও একমাস সময় দেওয়া আছে; এবং কেবল তাই নয়, যজ্ঞেশ্বর বাড়ি দেখে উঠে গেলেই চলবে; ভাড়া দেওয়া না দেওয়া নির্ভর করবে অতঃপর যজ্ঞেশ্বরের বিবেকের ওপর। এমনকি স্বর্ণদেবও যদি তার মায়ের চিঠি আর টাকাটা বার করে দিতো আগে? ভাবতে ভাবতে স্বর্ণদেবের চায়ের কাপে মুখ দিয়ে মেঝেয় পড়ে যাওয়ার দৃশ্য এসে দাঁড়ায় চোখের সামনে। আর দুহাতে চোখ ঢেকে ফেলে যজ্ঞেশ্বর। মুখ দিয়ে নিজের অজান্তেই বেরিয়ে যায়: না, না, না। আমি করিনি; আমি কিছু করিনি।

দৌড়ে আসে শশিকলা : কি হয়েছে? কি করোনি তুমি? যজ্ঞেশ্বর জবাব দেয় না, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে তারপর চলে যায় শশিকলা। আজ বেশ কদিন মদ না খেয়ে ফিরছে যজ্ঞেশ্বর। সম্ভবতঃ সেই কারণেই হয়তো এতো উত্তেজিত তার স্নায়ু যে কিছু দেখে ভয় পেয়েই এই চীৎকার। যজ্ঞেশ্বর মদ ছেড়ে দিলো, না, শশিকলা ভাববার চেষ্টা করে, স্বর্ণদেবের মা-বাবা কলকাতায় আছে বলে সতর্ক হয়ে চলেছে তার স্বামী।

একমাত্র ছেলের আকস্মিক অন্তর্ধানে অথবা অপঘাত মৃত্যুর আঘাত যত সাঙ্ঘাতিকই হোক,—সময় সব ঘা-ই একসময়ে সারায়। কলকাতায় আর থাকা চলে না; স্বর্ণদেবের বাবা-মা বিদায় নেন একদিন। পুলিশ তখনও পর্যন্ত বলতে কসুর করলো না যে স্বর্ণদেবকে পাওয়া যাবে কয়েকদিনের মধ্যেই; চিন্তা করছেন কেন অনর্থক স্বর্ণদেবের বাবা, এই হৃদয়হীন প্রশ্নও সঙ্গে জুড়ে দিতে ভুললো না অবশ্য লালপাগড়ি-র বড়ো কর্তা।

শশিকলা এবং উষা; গঙ্গাজল ও বেলফুল। আরেক পালা অশ্রুবর্ষণ করলো যাবার আগে; দুজনে দুজনের কাঁধে মাথা রেখে। শশিকলা প্রতিশ্রুতি দিলে যতদিন না স্বর্ণদেবের খবর মেলে ততদিন এখানকার পুলিশ কি করছে তার সংবাদ দেবে। তারকেশ্বরে হত্যা দেবে; কালীঘাটে মানৎ করবে। এবং উষার ছেলেকে ফিরিয়ে আনবে আবার উষার কোলেই। স্বর্ণদেবের মা-বাবা চলে যাবার পরও একটা বিশ্রী সন্দেহর চোরা পাহাড় মাঝে মাঝেই মনের সমুদ্রে ধাক্কা দেয় ভাবনার নৌককে। স্বর্ণদেব যেদিন আসে তার বাড়িতে সেদিন রাতে যে তার মনে হয়েছিলো একটা জোয়ান মানুষ যেন দড়াম করে মেঝেয় পড়ে গেছে আচমকা,—সে কি স্বপ্ন না সত্য? পরের দিন খেতে বসে যজ্ঞেশ্বর অবশ্য বলেছিলো যে শশিকলা তখনও,—সেই দিনের বেলাতেও স্বপ্নই দেখছে। তবুও থেকে থেকেই কেন যে সেই সন্দেহ চাড়া দেয় মাঝে মাঝেই,

কিছুতেই তার সঙ্গত, অসঙ্গত কোনও কারণই খুঁজে পায় না শশিকলা।

কেবল লক্ষ্য করে যে, স্বর্ণদেবের বাবা-মা চলে যাওয়ায় আবার অনেক স্বাভাবিক হয়ে গেছে যজ্ঞেশ্বর ; অনেক সহজ হয়েছে তার হাঁটা ফেরা। যেন দমবন্ধ করেছিলো তার মনের মধ্যে মন ; স্বর্ণদেবের বাবা-মা যেন চলে গিয়ে খুলে দিয়ে গেছেন জানলা দরজা সব। তাতেই গুমোট কেটে গিয়ে হেসে উঠেছে মনের অন্ধকূপ নতুন করে খুসির রৌদ্রালোকে। আরও লক্ষ্য করলো শশী যে তার স্বামী, স্বর্ণদেবের বাবা-মা চলে যাবার পরও মদ খায় না ; রাত করে বাড়ি ফেরে না আর। সন্ধ্যে হবার আগেই ফিরে আসে কুলায়। এবং ঘরে বিশ্রাম করে না ; গিয়ে বসে বাড়ির সঙ্গে লাগা সেই এক টুকরো খোলা অল্প অল্প ঘাস-মাঠে। ছেলেপিলেরা সেই মাঠে খেলতে এলে তাড়া দেয় তাদের। একা বসে একটা টুলের ওপর কেবল ভাবে ; চা খায় কাপের পর কাপ ; ধোঁয়া ছাড়ে।

আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করতে ভোলে না শশিকলা। এতকালের মধ্যে স্বামীকে এই সর্বপ্রথম বই নাড়াচাড়া করতে দেখে। ইয়া মোটা মোটা ইংরেজি বই। কেবল পাতা ওলটায় না যজ্ঞেশ্বর। পড়ে ; লাল পেন্সিলের দাগ দেয়। শশীকলা প্রায় মুখ্যু মেয়ে মানুষ। যে কথার নীচে লাল দাগ সে অক্ষরগুলো কিন্তু চিনতে পারে সে। ছেলে মেয়েদের ছবি ওঠাবার সাজ সরঞ্জাম যে ঘরে সে ঘরে একটা শিশির গায়ে সে এই অক্ষরগুলোই লেখা আছে দেখে আসছে এতকাল ; এবং সেই শিশির গায়েই কেবল যার গায়ে লাল মস্তো অক্ষরে লেখা আছে ঃ Poison [বিষ]।

তিন

হরিপদ দাশশর্মা, জগৎলালকে জিজ্ঞেস করলেন প্রথম যেকথা সেকথা হচ্ছে তার পদবী কি? জগৎলাল জানালো তার পদবী হচ্ছে মিত্র। ঘাবড়ে গেলেন হরিপদ অবিবাহিত মেয়ের পদবী বড়ুয়া অথচ তার বাবা নিজে বলছে বাবার পদবী মিত্র; কিন্তু পুলিশ অফিসারের পক্ষেও প্রশ্নটা করতে একটু বাধলো কোথায়। জগৎলাল বুদ্ধিমান; নিজে থেকেই তাঁর সন্দেহ নিরসনের কাজে চট করে এগিয়ে পড়লো: অবাক হচ্ছেন তো; আমার কুমারী কন্যার পদবী বড়ুয়া অথচ আমি তার বাবা; আমার পদবী মিত্তির হবে কেন,—এই তো আপনার প্রশ্ন? শুধু আপনার কেন যে শুনতো এমন ঘটনা, সে-ও এই বিংশ শতাব্দীতেও চমকাতো; এবং ঠিকই করতো। চমকাবারই কথা। লক্ষ্য করে দেখবেন, আপনার কাছে যে শ্লিপ পাঠিয়েছি তাতে কেবল আমার নামই আছে; পদবী নেই। শ্লিপটা তখনও পর্যন্ত হরিপদর হাতেই ছিলো। হাতের মুঠো খুলে দেখবার ভান করলেন বটে; কিন্তু হরিপদ আগেই তা লক্ষ্য করেছিলেন। এটুকু না লক্ষ্য করলে হরিপদ সম্পর্কে এতক্ষণ যে সব মহৎ মহৎ বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে তার সবটাই উপন্যাসের মতোই মুহূর্তে মিথ্যে হয়ে যায়; বাস্তব হয় না। হরিপদ জগৎলালের সামনে শ্লিপটা খুলে ধরে যখন বললেন: হ্যাঁ; তাইতো দেখছি—; এতে কেবল আপনার নাম জগৎলালই লিখেছেন—। —জগৎলাল তখন হাসতে হাসতে বললো: এখন নয়; আমার শ্লিপটা আপনার হাতে প্রথম যেতেই ওটা আপনার চোখ এড়ায়নি যে তা-ও জানি—

হরিপদ: কি করে জানলেন?

জগৎলাল : আপনি আজকে যেখান থেকে পুলিশের চাকরি সুরু করে যে পর্যন্ত উঠেছেন সে পর্যন্ত উঠতে পারতেন না যদি ওই সামান্য বিষয়টুকুও নজর এড়াতো আপনার—

হ : আমি কিন্তু নিজের সম্পর্কে এতটা জানতাম না জগৎবাবু—

জঃ সে আপনার অবিনয় ; আপনি একটু দাম্ভিক লোক—

হ : এই মেরেছে ; হাত-ফাত দেখতে জানেন না কি ?

জ : জানি। হাত নয় ; মানুষের মুখ পড়তে পারি। মানুষ হাতে লেখে বটে কিন্তু মানুষের হাতে তার স্রষ্টা কিছু লেখেন না—

হ : আমার মুখে কি দম্ভের প্রকাশ দেখলেন ?

জ : না—

হ : তবে ?

জ : আপনার মুখে মানুষের সব কটা রিপু আলোছায়ায় খেলা করছে দেখতে পাচ্ছি ; বাদ কেবল যে রিপুটি আপনার মধ্যে সব চেয়ে প্রবল,—সেই দম্ভ ; তার কোনও প্রকাশ আপনার মুখের কনটুরে নেই—

হ : যেটি নেই বলছেন সেটিই থাকার অভিযোগ করছেন ?

জ : না ; সেটি আপনার মুখে মাখানো নেই,—সেটিতেই আপনি সর্বদাই ভরপুর এই কথা বলতে যাচ্ছি এবং সত্য কথাই বলতে যাচ্ছি তা আমার চেয়ে বেশি জানেন যিনি তিনিই আপনি ?

হঃ আমি ?

জঃ আপনি ছাড়া আর কে জানতে পারে তা আপনার মতো ? বলুন ?

হঃ কেন ? আরেকজন অন্তর্যামী আমার সামনেই বসে রয়েছেন ; আমার সম্বন্ধে আমি আর কতটুকু জানি ? আপনি তো সবই জানেন—

জঃ সব না জানলেও, একটা জিনিস খুবই ভালো জানি—

হঃ কি সেটা ?

জঃ এটুকু জেনেছি যে আপনাকে যদি কেউ ইডিয়ট বলে তাহলে আপনি হাসবেন, ইডিয়টের মতোই মুখভঙ্গী করে হয়ত হাসবেন ; কিন্তু আপনাকে দাম্ভিক বললে ফোঁস করে উঠবেন আপনি—

হঃ কারণ ?

জঃ কারণ আপনি ইডিয়ট নন ; দাম্ভিক। তাই—

হঃ এরপর তো আব প্রতিবাদ করতেও ভরসা হচ্ছে না—

জঃ কেন ?

হঃ কারণ ফোঁস করে উঠলেই তো প্রমাণ হয়ে যাবে আমি দাম্ভিক। কিন্তু এতোসব জ্ঞান আপনাকে দিলো কে !

জঃ অভিজ্ঞতা !—অভিজ্ঞতা আমাকে আরও যা জানিয়েছে তা হচ্ছে—

হঃ থামলেন কেন ?

জঃ সভয়ে বলব না নির্ভয়ে বলব ?

হঃ যে পর্যন্ত অলরেডি বলেছেন তাতে ভয় না পেয়ে থাকলে এখন আপনার ভয় পাবার অর্থ হচ্ছে আমাকে ভয় দেখানো ;— তাই তো ?

ছিঃ ছিঃ ! কি যে বলেন ?—আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি জেনেছি যে পুলিশ আর ক্রিমিন্যাল একই মেডলের এপিঠ আর ওপিঠ ! ভালো ক্রিমিন্যালই ভালো পুলিশ হতে পারে এবং ভালো পুলিশই কেবল ভালো ক্রিমিন্যাল হতে পারে—

হ ঃ বুঝলাম না—

জ ঃ দেখুন যাদের আমরা জগতের সবচেয়ে বড় ক্রিমিন্যাল বলে জানি তারা যত বড় ক্রিমিন্যালই হোক,—তারা সব চেয়ে বড় ক্রিমিন্যাল নয় জগতের—

হ ঃ কেন ?

জ ঃ কারণ তাদের ক্রিমিন্যাল বলে চেনা গেছে ; সেই হচ্ছে সব চেয়ে বড় ক্রিমিন্যাল যাকে শেষ পর্যন্ত সাধু কি সাজ্মাতিক

ক্রিমিন্যাল বলে ঠাউরই করা যায় না; আর সেই হচ্ছে সব চেয়ে বড় পুলিশ যাকে পুলিশ বলে মনে হবে না কখনও—

হ: তার মানে আপনি বলতে চান যে—

জ: বলতে চাই যে আমি যে ব্যাপারে আপনার কাছে সাহায্যের জন্যে এসেছি সেব্যাপারে পুলিশ বলে আপনার এতটুকু গন্ধ বেরিয়ে পড়লেই সব পণ্ড হবে; কারণ—

হ: কারণ যার সঙ্গে আমাকে লড়তে হবে সে ক্রিমিন্যাল কি সাধু তা-ই ঠাওরানোই শক্ত—

জ: এক্স্যাকট্‌লি সো—

হ: বেশ এবার আসল কাহিনী আরম্ভ করুন—

জ: এক গেলাস জল—

ঘণ্টা বাজাতে যে এলো সে একখানা স্লিপ নিয়ে এলো হাতে। স্লিপখানা নিয়ে জগৎলালকে পার্টিশানের ওপারে অপেক্ষা করতে বলে জলের অর্ডার দিলেন সেপাইকে। তার পর নিয়ে আসতে বললেন স্লিপ যে দিয়েছে তাকে। ঘরে যে পরের মুহূর্তে এসে ঢুকলো তার দিকে পুলিশ অফিসারেরও অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাক্‌তে হয়। সুন্দরী বললে তাকে অসম্মান করা হয়। সুন্দরী স্ত্রীলোক আজও সংখ্যায় অল্প হলেও দেখা যায়। কিন্তু সে এলো ঘরে এই মাত্র সে কেবল সুন্দরী নয় শুধু স্ত্রীলোকও নয়; সম্রাজ্ঞী। যুগটা যদি আজকের না হয়ে মোগল আমল হতো তাহলে বলা চলত ঔরংজেবের দরবারে প্রবেশ করল জাহানারা। ঝলমল, ঝকমক করতে লাগলো পুলিশ হেড কোয়ার্টাসের অন্ধকার ঘুপচি। সোনার ওপর সূর্যের আলো পড়লে যেমন ঠিকরে পড়ে তেমনই ঘরের অন্ধকারে ঠিকরে পড়লো আগন্তুক। বড় সাহেব এসে ঢুকলে হঠাৎ যেরকম অবাক হতেন হরিপদ, উঠে দাঁড়াতে দেরী হতো; এ ভদ্রমহিলা এসে ঢুকতে বসতে বলবেন কি; ভুলে প্রায় উঠে দাঁড়াচ্ছিলেন তিনি।

সমস্ত শরীরে সেক্স এবং এবং সেনসার একই সঙ্গে জড়ানো। ঠোঁটের পুরুতে চোখের কালোয়, হাসির কটাক্ষে, শরীরের ঘ্রাণে, নিতম্বের ব্যাপ্তিতে ; চলার তালে পুরুষের রক্তে বান ডাকে। কথার স্বরে মাদকতায় গ্রীবার সাদায়, বুকের যেটুকু দেখা যায় সেটুকুতে লাল সাদায় আবার দুকুল প্লাবিত হয়ে উপচে পড়ে বাসনার প্রকাশ। কিন্তু ট্যাক্সি যেমন থেমে যায় হঠাৎ দারুণ ঝাঁকি দিয়ে ব্রেক কষে লাল অক্ষরে স্টপ জ্বলে উঠতেই, অথবা পুলিশের হঠাৎ হাত গজালে তেমনই এই মহিলার দিকে এগুতে গিয়ে চেতনা হয় যে মহিলা নয় মাত্র ; এ সম্রাজ্ঞী। এ যাকে করুণা করে সেই মাত্র হতে পারে এর অন্তরঙ্গ ; যাকে করুণা করবে না সে জগতের সবচেয়ে অর্থবান অথবা সমর্থবান হলেও তার এগুনো বন্ধ করে দিতে দ্বিধা করবে না যেমন দ্বিধা করে না ছবিঘরের মালিক হাউসফুলের সঙ্কেত ঝুলিয়ে দিতে।

ভদ্রমহিলার চোখে মুখে, কথায়, চলায়, কোথায় এমন ব্যক্তিত্ব ছড়ানো যা, যেকোনও একজন ব্যক্তির মধ্যেই অসম্ভব দুর্লভ। অথচ ঔদ্ধত্য নেই ; কথায় উত্তেজনার এতটুকু সঞ্চার নেই ; মুখের হাসিলেগে আছে সেই সেক্সি ঠোঁটে ; সেক্সিতর হাসি। দারুণ সংযত স্বর ; সংহত বাক্য। কারুর ঘরে আগুন লাগানোর আদেশ দেবার সময়ে ডাকাতের সর্দার যেমন হাসি মুখেই সে অর্ডার দেয় ; এমন হাসি মুখে যেন সিগারেটের ছাই এ্যাশট্রেতে ফেলতে বলছে সে কাউকে, তেমনই অনায়াসে, তেমনই হাসতে হাসতে এই সম্রাজ্ঞী না হয়েও সম্রাজ্ঞীর মতোই দেদীপ্যমান এই মহিলা, বসিয়ে দিতে পারে ছুরি। হরিপদর প্রথম ইম্প্রেসান যা হলো তা হচ্ছে জগৎলালের কথায়। পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় ক্রিমিন্যাল সেই যাকে দেখে মোটেই ক্রিমিন্যাল মনে হয় না। ভদ্রমহিলার দিকে আরেকবার তাকান ভালো করে ; আপাদমস্তক।

আমি চামেলী বড়ুয়ার মা—, কণ্ঠস্বরে যা ঝরে পড়ে তার

তুলনা চলে কেবল ভৃঙার থেকে মদ ঢালা'র সঙ্গে। মদের নেশা কেউ উচ্চারণে জড়িয়ে দিতে পারে এ বিশ্বাসের বাইরে ছিলো এতকাল। প্রত্যেকটি অক্ষরে এমন মাতাল করা সুবাস সঞ্চরিত যেন মনে হয় কথা নয় সুরভিত মদ গিলছি। প্রত্যেকটি শব্দের মধ্যে স্বরের পেয়ালা ছাপিয়ে ঝরে পড়ছে সুরের সুরধুনী। সান্ত্বনা নয়; এই কথা বয়ে নিয়ে আসছে যে তার নাম দেওয়া যেতে পারে তীব্রমধুর।

ভদ্রমহিলা বলেন আবার: আপনার কাছে এসেছি বিপদে পড়ে—হরিপদ বলেন এতক্ষণে; একটি মাত্র কথা এতক্ষণে নির্গত হয় তার মুখ ভিতর থেকে: কি বিপদ, বলুন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এক

যজ্ঞেশ্বর রায়ের জীবনে ঠিক সেই সময়ে সৌভাগ্যসূর্য্য উদিত হচ্ছিল সাঙ্ঘাতিক দ্রুত লম্ফনে। বেলফুলের ধার দেওয়া হাজার টাকা হাত দিয়েও ছোঁয়নি শশিকলা শেষ পর্যন্ত। বাড়িওলার ডিক্রি, যার জন্যে এই হাজার টাকা,—তা জারী হয়নি আদৌ। যজ্ঞেশ্বর কেবল বুঝেছিলো একটি সত্য। পৃথিবীটা কার,—এই জিজ্ঞাসার মধ্যেই যে তার অবধারিত নির্ভুল উত্তর আত্মগোপন করে আছে, পৃথিবী টাকার,—অভাবের তিক্ত অশ্রুজলের অভিজ্ঞতায় এ জ্ঞান অর্জন করেছিলো যজ্ঞেশ্বর। মদ্যত্যাগ করে উঠে পড়ে লেগেছিলো সেই উত্তর জীবন দিয়ে মেলাতে। এবং টাকা রোজগারের ক্ষেত্রে অন্যায় কিছু নেই এই বিশ্বাস ক্রমে বলবান হচ্ছিলো তার মনে। ন্যায়ের টাকা, অন্যায়ের টাকা বলে কিছু নেই; টাকা,—টাকাই। একবার করে ফেলতে পারলেই হলো। তারপর কি করে টাকা করলে সে প্রশ্ন করবার সাহস হয় না আর তাদের যাদের অত টাকা নেই। যাদের আছে তারাও ঘাঁটায় না; কারণ তাদের টাকাও যেখান থেকে এসেছে সেই গর্ত খুঁড়লে কেঁচোর বদলে সাপ বেরিয়ে পড়বে। দু, দশ, বিশ, পঁচিশ হাজার টাকায় সাহস হয় লোকের প্রশ্ন করবার; ইনকাম ট্যাক্সেরও হয়। কিন্তু চল্লিশ পঞ্চাশ লাখ টাকা করলে দুঃসাহস করে না কেউ; ইনকাম ট্যাক্সও ঘাবড়ায়। বলে: গোপন টাকার অঙ্ক ডিক্লেয়ার করলে মার্জনা মিলবে।

কিন্তু বিপুল টাকা অন্যায় রাস্তায় করবার জন্যেও প্রয়োজন

হয় কিছু টাকার; ক্যাপিটালের। কারণ জলে জল যেমন, টাকায় তেমনই টাকা বাধে। মাত্র হাজার টাকায় হাজার টাকা যেখানে হয় সেই শেয়ার বেচা কেনার প্রতিষ্ঠানেই কাজ করে যজ্ঞেশ্বর; ঠিক। কিন্তু সেখানেও হাজার টাকায় জুৎ মতো কোনও খবর পেলে কয়েক হাজার টাকা হয়ত হয়; কিন্তু সেই টাকা হয় কি, যেটাকা হলে জিজ্ঞেস করতে ভরসা পায় না কেউ, এত অল্প সময়ে হঠাৎ রাত কাবার না হতেই এতে পয়সা হয় কি করে। ঠিক এই সময়ে যে প্রতিষ্ঠানে যজ্ঞেশ্বর কাজ করে সেখানে একটি চিঠি এলো এমন একটী খবর নিয়ে যে চিঠি এবং যে খবর যজ্ঞেশ্বরের জানার কথা নয়। চিঠিটা প্রথম আসে যজ্ঞেশ্বরের হাতে; যজ্ঞেশ্বরের কর্তব্য ছিলো সেটি যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়া। যজ্ঞেশ্বর চিঠিটা হাতে করে কি ভাবলো;– তারপর সেটিকে পকেটে করে বাড়ি নিয়ে এলো ঝানু পকেটমার যেমন রাস্তায় অগুন্তি পকেটের মধ্যে ঠিক বুঝতে পারে কোন্ পকেটে মাল আছে আর কার কেবল বাইরেই কোঁচার পত্তন, ভেতরে ছুঁচোর কেত্তন; আরও ওস্তাদ পিকপকেট যেমন পকেট দেখেই বলে দেবার ক্ষমতা রাখে কত টাকা মোটামুটি সেখানে আছে এবং তার মধ্যে কখনো দশটাকার, কখন পাঁচটাকার এবং কখনও যদি থাকে তাহলে একশো টাকার কটা,-তেমনই যজ্ঞেশ্বরেরাও শেয়ার প্রতিষ্ঠানের ঠিকানায় আসা চিঠি হাতে নিয়েই বলে দিতে পারে কোন্ চিঠিতে আছে সেই খবর, যেখবর হাতে এলে, হাতের মুঠো খুললেই দেখা যাবে ধুলোমুঠি সোনা মুঠি হয়ে গেছে।

চিঠিটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে খুলবার পর সত্য বলে প্রমানিত হয় যে যজ্ঞেশ্বর ঠিকই স্মেল করেছিলো। চিঠির ভেতর খবর ছিলো যে তখনকার দিনে বিখ্যাত এডোয়াড এণ্ড এডোয়ার্ডসের শেয়ারের দাম সাঙ্ঘাতিক বাড়বে আর আটচল্লিশ ঘণ্টা পর থেকেই। চিঠিটা পড়তে পড়তে জ্বলে উঠলো যজ্ঞেশ্বরের চোখ। পনেরখানা একশো

টাকার শেয়ার যদি কিনতে পারে তাহলেও দর যা উঠবে বলে সেই চিঠি বলছে তাতে তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা মিনিমাম হবার কথা। কিন্তু দেড় হাজার টাকাও যজ্ঞেশ্বরের হাতে নেই।

পরের দিন অফিসের দারোয়ানের হাতে পায়ে ধরে পাঁচশো টাকা আদায় করলো যজ্ঞেশ্বর। ধার নয়। পার্টনারশিপ। দারোয়ানকে বললো যদি লাভ না হয় ফাটকায় তাহলে তার টাকা সুদ সুদ্ধ ফেরৎ দেবে। যদি ফাটকা বাজি মারে, তাহলে তার ওপর আরও পাঁচ হাজার টাকা। চিঠিটা দেখায় তাকে। যজ্ঞেশ্বরের কুষ্ঠি জুতের হবার কারণে অথবা দরোয়ানের অতিরিক্ত লালসার অকারণে কে জানে পাঁচশো টাকা বারকরে দেয় মুঙ্গেরজেলা। নিজে যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করে সেখানকার কোনও লোকের সে প্রতিষ্ঠানে ফাটকা খেলবাব উপায় নেই; অন্য প্রতিষ্ঠানে খেলাও বেআইনী। ধরা পড়লে চাকরী যেতে পারে। তবুও যজ্ঞেশ্বর নিজস্ব নামই অন্যজায়গায় এডোয়ার্ড কোম্পানীর পনেরখানা একশো টাকার শেয়ারের জন্যে টেলিফোনে কিনবার অর্ডার দিলো। সেখানে যজ্ঞেশ্বরকে চিনতো আরেক শেয়ার প্রতিষ্ঠানের পুরাতন কর্মী বলে। সেই কারণে টেলিফোনেই কাজ হলো; টাকা পরে পাঠিয়ে দিলেই চলবার এরেঞ্জমেন্টে। ইতোমধ্যে চিঠিটা আবার অফিসে যথাস্থানে পৌঁছে দিলো যজ্ঞেশ্বর।

চিঠির কথাও মিথ্যে হলো শেষ পর্যন্ত। মিথ্যে প্রতিপন্ন হলো ইন দিস সেনস যে যত দূর উঠবে শেয়ারের দাম বলে অনুমান করেছিলো সেই চিঠি, দর উঠলো তার তুলনায় এত উঁচুতে যত উঁচু রাধানাথ সিকদার যে সর্বোচ্চ পর্বতচূড়া আবিষ্কার করেছিলেন অথচ যা চলে এভারেস্টের নাম বহন করে, সেই মাউণ্ট এভারেস্ট যত উঁচু পরেশনাথ পাহাড়ের তুলনায়। তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা লাভ হবে মনে হয়েছিলো; এখন মিনিমাম লাভ দাঁড়াবে দেড় থেকে দুলাখ। কিন্তু তখনও যজ্ঞেশ্বর জানতো না তার জন্যে

ভাগ্য অপেক্ষা করে আছে। যে প্রতিষ্ঠানের মারফৎ কিনেছিলো শেয়ার তারা যখন জানতে চাইলো আরও ধরে রাখবে না ছেড়ে দেবে। তখন যজ্ঞেশ্বর জানতে চাইলো এখন ছেড়ে দিলে তার লাভ কত দাঁড়াচ্ছে। কোম্পানী জানালো, এখন ছাড়লে দশ থেকে বারো লাখ; আর ধরে রাখলে—। যজ্ঞেশ্বর বাকীটা শুনবার আগেই বললো ঃ আরও আটচল্লিশ ঘণ্টা ধরে রাখতে।

দেড়লাখ লাভ দশলাখে ওঠার কারণ, যজ্ঞেশ্বর পনেরখানা শটাকার শেয়ার ধরতে বলেছিলো টেলিফোনে। আর যে ধরেছিল সেই টেলিফোন সে শুনেছিলো পনেরশো একশোটাকার শেয়ার ধরতে বলেছে যজ্ঞেশ্বর।

খোদা দিলে ছপ্‌পড় ফুঁড়েই দেন, একথা আরেকবার প্রমাণিত হলো যার জীবনে তার নামই যজ্ঞেশ্বর রায়।

দুই

ভদ্রমহিলা বললেন ঃ চামেলী বড়ুয়ার আমি মা; আমার নাম—

হরিপদ বাধা দিলেন ঃ আপনার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, সেক্সপীয়ার পড়া আছে—

চামেলীর মা ঃ কোনও কোনও জায়গা মুখস্থও আছে।

হরি ঃ সেক্সপীয়ার বলেছেন নামে কিছু এসে যায় না; আপনার কি বিপদ তাই বলুন—

চাঃ মাঃ সে তো গোলাপের বেলায়—

হঃ গোলাপফুলের মতো সুন্দরী নারীর বেলাও তাই—

সুদারুণ বক্তিত্বময় সেই মুখেও বেলা শেষের আকাশে ছড়িয়ে

যাওয়া ফাগের লাল রং লজ্জার ব্যতিক্রম হলো না; হাজার হলেও সে মুখ নারীর।

চাঃ মাঃ জগৎলাল বলে একটি সাজ্ঘাতিক লোক চামেলীকে তার মেয়ে বলে দাবী করছে আজ বহুকাল; কিন্তু চামেলী বড়ুয়া তার মেয়ে নন।

হঃ বেশ; তাতে বিপদের কি আছে?

চাঃ মাঃ বিপদ সেখানে নয়; বিপদ হচ্ছে, এই জগৎলাল স্বর্ণদেব সরকার হত্যার মামলায় আমাদের জড়িয়ে দিতে চায়—

হঃ তার স্বার্থ?

চাঃ মাঃ আমাদের মানে, আমাকে জড়িয়ে দিয়ে এই হত্যা-মামলার সঙ্গে চামেলীকে তার মেয়ে বলে প্রমাণ করার সুবিধে হয়—

হঃ আপনি না জেনে নিজেই এ মামলার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলছেন যে—

চাঃ মাঃ কি রকম?

হঃ আপনি স্বর্ণদেব হত্যা-মামলা, হত্যা-মামলা বলছেন যতবার ধরা দিচ্ছেন ততবার নিজেকে—

চাঃ মাঃ কেন?

হঃ কারণ পুলিশ এখনও পর্যন্ত একবারও বলে নি যে স্বর্ণদেব নিহতই হয়েছে; স্বর্ণদেব নিরুদ্দেশ হয়েও থাকতে পারে—

এক মুহূর্ত সেই মুখে মেঘের কালো ছায়া পড়েই সরে গেলো সাঁৎ করে। তীক্ষ্ণদৃষ্টি হরিপদর তা নজর এড়ালো না; কিন্তু মুখখানা এমনই এই পুলিশ অফিসারের যে সে মুখে মনের কোনও প্রতিবিম্ব প'ড়ে কদাচ।

চাঃ মাঃ না। স্বর্ণদেব নিরুদ্দেশ হয়নি; নিহতই হয়েছে; তাকে খুন করেছে—

হঃ আপনার মতে,—যে তাকে খুন করেছে সে এই পার্টিশানের

ওদিকে বসে আছে ; আপনি চলে গেলে বলবার জন্তে যে আপনি চামেলীর কেউ নন ; এবং স্বর্ণদেব হত্যার মামলায় তার নাম জড়িয়ে দিয়ে চামেলীকে আপনার মেয়ে বলে দাবীর প্রমাণ হয় বলেই তাকে ঝুলিয়ে দিতে চাইছেন। ডাকব, জগৎলালকে—

তারপর ভদ্রমহিলার অসম্ভব রক্তশূন্য হয়ে যাওয়া মুখের করুণ এপ্লিকেশন গ্রাহ্য না করে ডাকেন : জগৎলাল! জগৎলাল! জগৎলালের কাছ থেকে সাড়া এলো না কোনও। ঘণ্টা বাজালেন হরিপদ ; তারপর নিজেই গেলেন ওধারে। জগৎলাল চেয়ারে বসে আছে।

হরি : কি হে কালা নাকি? এতো ডাকছি জবাব দিচ্ছ না কেন?

জগৎলাল তখনও সাড়া না দিয়ে বসে থাকে চুপ করে। হরিপদ গিয়ে জগৎলালের গায়ে নাড়া দিতেই ধুপ করে পড়ে যায় জগৎ-লাল ; আধখানা চেয়ার ছাড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে মাটিতে। জগৎলালের হাত হাতে তুলে নেন হরিপদ ; পরের মুহূর্তেই ছেড়ে দেন। জগৎ-লাল জীবিত নেই। বিদ্যুতের মতো এঘরের ভদ্রমহিলার চেহারা চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। দৌড়ে আসেন এঘরে। ঘর খালি। ভদ্রমহিলা নেই ঘরে।

হরিপদ বুঝতে পারেন। জগৎলাল এখানে আছে বা থাকতে পারে ভাবতে পারলে ভদ্রমহিলা এখানে আসার এবং চামেলীর মা বলে নিজের পরিচয় দেবার দুঃসাহস করতেন না। জগৎলাল এমন কোনও তথ্য জানতো যা পুলিশ জানলে এ ভদ্রমহিলার বিপদ ছিলো। তাই জগৎলালের ঘরের দিকে হরিপদ এগুনো মাত্তর তিনি সরে পড়েছেন, তার কিন্তু সরে না পড়লেও চলতো ; এখনকার মতো অন্তত। কারণ জগৎলাল তার আগেই, এই ঘর, এই শহর, এই দুনিয়া থেকেই সরে পড়েছে।

জগৎলালের মৃতদেহ পোষ্ট মর্টেমের জন্তে পাঠিয়ে হরিপদ

যখন নিজের কোয়ার্টারে যাবার জন্যে উঠছেন তখন তাঁর ইমিডিয়েট সার্বডিনেট একজন এসে জানালো যে জগৎলালের মৃতদেহ সার্চ করে একটা ডায়েরী পাওয়া গেছে। হরিপদ সেটা চেয়ে নিলেন; এবং খাবার কথা ভুলে আবার ঘরে এসে বসলেন। জগৎলাল যা বলতে চেয়েছিল হরিপদকেও তা মুখে বলতে না পারলেও তার অনেকটাই বলে গেছে এই দিনপঞ্জীতে।

তিন

জগৎলালের ডায়েরী থেকে জানা গেল যে চামেলীর সঙ্গে স্বর্ণদেবের ঘনিষ্ঠতা চামেলীর মায়ের মনোমত নয়। তার আগে জগৎলালের সঙ্গে চামেলীর মা মণিমালার কলহের কারণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে দিনপঞ্জীতে। সেই অংশের সারমর্ম এখানেও আগে বিবৃত করা দরকার। জগৎলালের সঙ্গে মণিমালার দেখা হয় বিশ বছর আগে; মণিমালার বয়স তখন খুব বেশি হলে হবে উনিশ; জগৎলালের বয়সও তখন তুলনায় বেশি নয়; তবে মণিমালার তুলনায় একটু বেশিই : জগৎ-লাল নিতান্ত অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলতে বাধ্য হয়ে মণিমালাকে। জগৎলালের ডায়েরীতে সে ঘটনার বিবরণ গলাধঃকরণ করতে করতে মনে পড়ে যায় পুলিশের বিচক্ষণতম কর্মচারী হরিপদ দাশশর্মার বিশ বছর আগেকার স্মৃতি। প্রথমে আবছা আবছা; পরে ধোঁয়া ধোঁয়া। পরে স্পষ্ট এসে দাঁড়ায় আজ থেকে কুড়ি বছর আগে একদিন এমনই থানায় এসেছিল বটে জগৎলাল মিত্র। সেদিন হরিপদ দাশ শর্মার বয়স ছিলো বোধ হয় আরও কম। পুলিশে সবেমাত্র ঢুকেছেন সেদিন; পুরো পুলিশ হবার অনেক বাকী তখনও। তখনও থানায় বসে খুনখারাপীর চেয়ে

অনেক বেশি উত্তেজনা বোধ করেন সাহিত্য-সঙ্গীত চর্চায়। যেদিনকার কথা লিখছে জগৎলাল তার দিনলিপিতে সেদিনও হরিপদ তাঁর সমবয়সী কয়েকজন সন্থ-পুলিশের সঙ্গে থানার এককোণে টেবিলের চারপাশে গোল হয়ে বসে তর্ক করছে সেদিন বাঙলা সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া কোন একখানা বই নিয়ে।

ঘরের মাঝখানে রাখা লম্বা বড় টেবলের সামনে একখানা চেয়ারে বসে ঝিমুচ্ছিলেন একা ব্রজবাবু; ব্রজ দত্ত। ব্রজ দত্ত, তদানীন্তন কলকাতায় বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খাওয়ানো দারুণ দুর্দান্ত পুলিশ অফিসার। ব্রজ দত্তর ঝিমুনো মানে ঝিমুনো নয়; বকের চোখ বুজে ধ্যানের ছলে একটু অসতর্ক মাছের অনুসন্ধান করা মাত্র। এত কর্মদক্ষ পুলিশ অফিসার সেদিনকার, সেই বিশ বছর আগের ক্যালকাটা পুলিশে একজনও ছিল না। যেমন সাহস; তেমনই বুদ্ধি। আর তেমনই তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি। মাঝে মাঝে হরিপদ এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোদেরই মনে হতো লোকটা অন্তর্যামী না কি। পেটের কথা টেনে বার করা কখনও মাথায় হাত বুলিয়ে; কখনও ভয় দেখিয়ে; কখনও কেবলমাত্র চোখের দিকে তাকিয়ে। প্রথম দুটোর জন্যে বিস্ময়ের সঞ্চার হয় না হরিপদদের মতো সন্থ-পুলিশের চোখের কোনাতেও। কিন্তু শেষেরটি ঝানু পুলিশের পক্ষেও ব্যাখ্যার অতীত। তারা বলে ব্রজবাবুর সেই ইনট্যুশান আছে, সেই তৃতীয় দৃষ্টি যা না হলে কেউ বেঁচে থাকতে থাকতেই কিমবদন্তীর হতে পারে না নায়ক। ব্রজ দত্ত মানুষ দেখলেই স্মেল করতে পারে, বলে দিতে পারে, লোকটা অপরাধী না নিরপরাধ। তার এই ব্যাখ্যার অতীত অন্তর্যামী দৃষ্টির জন্যে পুলিশের ভেতরে-বাইরে ব্রজ দত্ত সম্পর্কে এমন সব সত্য, অর্দ্ধসত্য, অসত্য গল্প চালু হয়েছিলো সেদিন যে আজও লোকে প্রশ্ন করে, ব্রজ দত্ত না কি একবার শ্মশানের ডোম সেজে বিষ দিয়ে মারা

হয়েছে সন্দেহে একজনকে আধপোড়া অবস্থায় চিতা থেকে বার করে তার হত্যাকারীকে শেষ পর্যন্ত ফাঁসিকাঠে লটকায়।

কিন্তু চাঁদের মতোই ব্রজ দত্ত নিষ্কলঙ্ক পুরুষ নয়। বরং সেই একদোষেই শেষ পর্যন্ত লোকটার সমস্ত গুণ ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো। ঘুস; ব্রজ দত্তর চরিত্রের এক বালতি দুধে এই এক ফোঁটা চোনাই শেষ পর্য্যন্ত কাল হল তার। চাকরি ছেড়ে দিতে হলো রিটায়ার্মেণ্ট-এজের আগেই। পেনসন এবং পদত্যাগের বিনিময়ে কিছুটা কিছুটা বেনিফিট অভ ডাউটের কল্যাণে, কিছুটা ঐতিহাসিক কর্মদক্ষতার কারণে জেল হলো না কেবল। অন্য যে কেউ হলে তা ছাড়া উপায় থাকত না আর। কিন্তু সে-প্রসঙ্গ একাহিনীর পক্ষে সম্পূর্ণ অবান্তর; তাই সেকথা থাক। তার বদলে বিশ বছর আগের একদিনের, যেদিন জগৎলালকে প্রথম দেখেন হরিপদ সেদিনকার ঘটনাই বিবৃত করা যাক সংক্ষেপে। আগেই বলেছি, হরিপদ সবান্ধব যখন থানার এককোণে সংস্কৃতি চর্চায় মগ্ন এবং ব্রজদত্ত আরেক টেবুলে ঝিমুনোর অছিলায় কাউকে ফাঁসানোর চিন্তায় ব্যাপৃত। সেই সময়ে অতিরিক্ত কিছু নগদের প্রয়োজন, জরুরী প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো তার। ঠিক সে সময়ে সুযোগ পায়ে হেঁটে এসে ঢুকলো তার হাতের মুঠোয়। ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো এক অত্যন্ত সুবেশ সুপুরুষ তরুণ; সঙ্গে তার চেয়ে অনেক সুন্দর একটি মেয়ে। থানার অন্ধকার ঘুপচি যেন মুহূর্তে ইল্যুমিনেটেড হলো দেয়ালীর রাত্রের মতো। সংস্কৃতিচর্চা বন্ধ হলো হরিপদদের টেবলে; কেবল ব্রজ দত্ত, তদানীন্তন কলকাতা আরক্ষবাহিনীর লেজেণ্ড ঝিমুতেই থাকলো তখনও; যেন কিছুই হয়নি।

ছেলেটি অত্যন্ত সপ্রতিভ; থানায় এসেছে কি বান্ধবী নিয়ে ছবি দেখতে এসেছে কে বলবে। ব্লাক এণ্ড হোয়াইটের টিনটা টেবলের ওপর রেখে একমুখ ধোঁয়া মুখ থেকে বার করে দিয়ে বলল

আমার নাম শঙ্কর বড়ুয়া; এ মেয়েটির নাম মণিমালা বোস। একে ইলোপ করার চার্জ আছে আমার নামে; ডায়েরিতে পাবেন। আমি একে বিবাহ করেছি কাশীতে। এ মেজর। এই আমাদের বিবাহের প্রমাণপত্তর! নিন এখন কি করতে চান, করুণ।

মেয়েটি তার স্টেটমেণ্টে বললো যে স্বেচ্ছায় শঙ্করের সঙ্গে চলে গিয়ে বিবাহ করেছে। হরিপদদের মধ্যে কে একজন তার স্টেট-মেণ্ট রেকর্ড করছিলো; সে প্রশ্ন করলোঃ আপনি এর সঙ্গে পালিয়ে গেলেন? আপনার বাড়ির সম্মানের কথা একবার ভাবলেন না? বংশপরিচয়? সামাজিক প্রেষ্টিজ? মেয়েটি তার জবাবে বুঝিয়ে দিলো, সে যার সঙ্গে পালিয়ে গেছে তার থেকেও স্মার্ট; বললোঃ বাড়ির সম্মান, নিজের সম্মান এবং বংশের মান রাখতেই আমি বিবাহ করেছি—। পুনরায় তাকে জেরার চেষ্টায় সে অস্বীকৃত হলো আর কিছু বলতে; কেবল তার এই স্টেটমেণ্টই ফ্যাইন্যাল স্টেটমেণ্ট বলে রেকর্ড করতে বললো; বাকী যদি কিছু বলতে হয় ফার্দার সে কোর্টেই বলবে।

অগত্যা নিরস্ত হতে হয় জেরাকারীকে। চুপচাপ নকল করে যেতে হয় মণিমালার বক্তব্যের প্রতিলিপি। ঠিক সেই সময়ে ঝিমুনি বন্ধ হয় ব্রজ দত্তর ঃ গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে যেন ক্ষুধিত সিংহ ঃ এসো তো মা, একবার এদিকে; তোমার কথা ভালো করে বুঝি—

মণিমালা উঠে যায় কেমন যেন হিপন্‌টাইজড্‌ অবস্থায়। হরিপদ সবান্ধব অপেক্ষা করে তটস্থ হয়ে; ঝড় উঠলো বলে; একটু বাদেই সুরু হবে বর্ষন। ঝড়ের আগের মুহূর্তের আকাশের মতো থমথম করতে থাকে আবার অন্ধকার ঘুপচি; শঙ্কর কেবল একটা সিগারেটের আগুন থেকে ধরায় আরেকটা আগুন। ঠোঁটের এক কোনে সিগারেট এবং আরেক কোনে তখনও ঝুলতে থাকে যখন এসে ঢুকেছিলো তখনও যেমন, এখনও তেমনি, মিষ্টি এক টুকরো হাসি।

ব্রজবাবু মেয়েটিকে আপদমস্তক তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের তীব্র রঞ্জন-রশ্মির তলায় পরীক্ষা করলেন কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপর সস্নেহ জিজ্ঞাসা করলেন : এর সঙ্গে কতদিন হলো বিবাহ হয়েছে, বললে ? মেয়েটি একটু থেমে আগেকার মতোই সমান সপ্রতিভ কণ্ঠে উত্তর দিলো : এক মাস ; ঠিক আজকের তারিখে গতমাসে কাশীতে আমাদের বিয়ে হয়েছে—! 'কিন্তু',—ডাক্তার যেমন খারাপ রোগ লুকোবার চেষ্টা করতে দেখলে হাসে, চার্লি চ্যাপলিন-গোঁফে তেমনই ব্রজদত্ত শেয়ালের ধূর্ত হাসি হাসছেন, 'কিন্তু,' বলে এখন। তারপর হাসি মিলিয়ে গেলে নিদারুণ নীরস স্বরে রায় দেন ব্রজবাবু : কিন্তু মা তোমার শরীর খারাপ হয়েছে তো দেখেছি প্রায় তিন মাস। ঘরেব মধ্যে কয়েক পলকের সেই নীরবতা অপেক্ষা করতে লাগলো রূপালী পর্দায় নাটকে নায়কের অজ্ঞাতে ভিলেনের পুঁতে রেখে যাওয়া ডিনামাইট ফাটো-ফাটো হবার মুহূর্তে যেমন নিঃশ্বাস পর্যন্ত রুদ্ধ করে রাখে দর্শকেরা, নায়ক কি ভাবে শেষ পর্যন্ত রক্ষা পায় তারই উগ্রমধুব উত্তেজিত এক্স্পেকটেশানে, সেই অবস্থার অনুরূপ অখণ্ড নৈঃশব্দগ্রাস করলো থানার অন্ধকার অস্তিত্বকে। তারপরেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ ভেঙ্গে পড়া বজ্রের আলোক ধ্বনিতে অপরূপ অবর্ণনীয় কয়েক মুহূর্তের বাদ প্রতিবাদে উজ্জীবন্ত হলো থানার অন্ধকার।

সিগারেটটা পা দিয়ে পিষে, লেগে থাকা হাসিকে মুখের বিবরে ঢুকিয়ে দিয়ে শঙ্কর বড়ুয়া প্রতিবাদে মুখর হোলো : হোয়াট ডু য়ু মিন ? সেই একটি ছোট্ট প্রশ্নের পা শঙ্করের অজান্তে জ্যান্ত সাপের লেজে পড়লো যেন ; ফোঁস করে ওঠেন ব্রজ দত্ত, তদানীন্তন কলকাতা আরক্ষবাহিনীতে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাওয়ানো দোর্দণ্ড প্রতাপ বড়বাবু : আই মিন হোয়াট আই সে। তখন আর ব্রজ নয় ; তখন বজ্র। কথা বলবার সঙ্গে পরশুনামের গল্পকে আরও হাস্যকর করবার জন্যে যেমন যতীন সেনের অনিবার্য স্কেচ

তেমনই ব্রজ দত্তের টেবিলের ওপর প্রচণ্ড ঘুঁষির সশব্দ ইলাস্ট্রেশান। টেবল, টেবলের সঙ্গে মেঝে, দেওয়াল কড়িবরগা, মায় থানা পর্যন্ত, এবং থানার চেয়ে আগে থানারই এক অন্ধকার ঘরে-বসা সব কজনের অন্তরাত্মা পর্যন্ত কেঁপে উঠলো। কে বলবে যে একটু আগে যে ঘরের মাঝখানে একখানা টেবলের সামনে এক হাতল ভাঙ্গা একখানা চেয়ারে বসে আফিং-আলস্যে ঝিমুচ্ছিলো, সে. আর এখন যার হুঙ্কারে বাইরের লোক তো বটেই পুলিসের লোকও ভয়ে চুপ করে গেছে, সে,—একই লোক ; দুটি সত্বার বাস যে একটি ডালে সে মানব-বৃক্ষের আদি ও অকৃত্রিম নাম একইঃ ব্রজ দত্ত।

মেয়েটি সেই এক দাবড়ানিতে ঝরঝর করে কেঁদে বিবৃত করলো তার সমস্ত নেপথ্য কাহিনী।

সেণ্ট্রাল এভ্যেনু সেদিনী চিত্তরঞ্জন এভ্যেনু হয়েছে কি তখনও হয়নি ; সবচেয়ে সাদা, সবচেয়ে বড় বাড়িতে সেই রাস্তার, থাকতো মণিমালা। বাবা তাঁর মারা গেছেন বটে কিন্তু একমাত্র মেয়ের জন্যে যথেষ্টরও অতিরিক্ত রেখে গেছেন। সেই মণিমালার অল্প বয়সের সুযোগ নিয়ে অন্তঃসত্বা করে তাকে যে, সে-ই থানায় ডায়রি করে যায় শঙ্কর বড়ুয়ার নামে ; শঙ্কর মনিকে নিয়ে পালিয়ে গেছে এই অভিযোগে। যে লোকটি মনিমালার সর্বনাশ করে সে আসলে মণিমালার কাকার প্রিয়ভাজন। মণিমালার নিজের কাকা নয় বটে কিন্তু তার ছেলেরাই মণিমালার বাবার সব চেয়ে নিকটাত্মীয় হবার কারণে মণিমালার অবর্তমানে সব সম্পত্তির এয়ার। নিজের মেয়েকে যথেষ্টর অতিরিক্ত দেবার পরেও মণিমালার কাকার ছেলেদের যে একেবারে বঞ্চিত করেছেন মণিমালার বাবা তা নয় ; তাদেরও দুহাতে টাকা এবং সম্পত্তির অংশ ভাগ করে দিয়ে গেছেন মারা যাবার আগে। কিন্তু তাতেও অর্থলাভের নিবৃত্তি হয়নি মণিমালার একটু দূর সম্পর্কের এই মনুষ্যদেহে-পিশাচ কাকার।

যার সঙ্গে মণিমালার অসঙ্কোচ অকারণ মেলামেশার ফলে

এই বিপত্তি, তার সঙ্গে অন্তরঙ্গতার মূলেই কুঠারাঘাতে নির্মূল করার যথেষ্ট সময়-সুযোগ থাকতেই মণিমালার কাকা তা গ্রহণ করেননি ; ইচ্ছে করে আরও আলগা দিয়েছেন মণিকে। মণিমালার শুভানুধ্যায়ীদের কাছে যখন স্পষ্ট হলো তার কাকার স্বার্থ দিবা-লোকের মতো, যে, মণিকে বিপথগামীর লজ্জা দিয়ে হয় আত্মহত্যায় নয় গৃহত্যাগে উদ্যোগী করতে পারলেই মণির সম্পত্তি তার করতলগত হয়, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। মণিমালা তখন কুমারী অবস্থায় মা হয়েছে ; গর্ভপাত করিয়ে লজ্জার হাত থেকে রেহাই পাবার চেষ্টায় বাধা দিয়েছে মণিমালা ; মণিমালা বাধা দিলেও তা কাজের হতো কতদূর বলা শক্ত ; কিন্তু ডাক্তারের কাছ থেকেও আপত্তি ওঠায় শেষ পর্যন্ত সে দুষ্কর্ম পর্যন্ত আর গড়াতে সাহস করেনি মণিমালার সম্পর্কে-কাকা।

এই সময়ে মণিমালাদের বাড়ীতে 'পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিত' ; সে ক'জনের মধ্যে শঙ্কর বড়ুয়া সব চেয়ে লাজুক, সবচেয়ে ভদ্র এবং সব চেয়ে জেনুইন ছিলো। মণিমালা তাকে একটি চিঠিতে সব জানায় ; খুলেই লেখে সব ; মায় নিজের লজ্জার কথা পর্যন্ত কিছুই গোপন করে না। শঙ্কর বড়ুয়া সব জেনেই উদ্ধার করে মণিমালাকে ; কাশীতে পালিয়ে গিয়ে আইন সম্মত ভাবেই বিবাহ করে এই প্রবঞ্চিত অসাধারণ রূপসী তরুণীকে।

মনিমালার কাকা পুলিশে ডায়রী করে প্ল্যানানুযায়ী। সেই খবর আন্দাজ করে এবং পেয়ে শঙ্কর বড়ুয়া মণিমালা সমেত থানায় এসেছে স্টেটমেণ্ট দিতে। ব্রজ দত্ত মণিমালার কাকাকে ডাকতে পাঠালেন। কাকা এলে মনিমালার সামনে তাকে যা বলেন তা এক পুলিসের পক্ষেই সম্ভব। মণিমালার কাকা ডায়রি প্রত্যাহার করতে চাইলে রিয়্যাল ব্রজ দত্ত বেরিয়ে আসে সেই মোমেণ্টেই। সোজাসুজি মণিমালার কাকাকে, ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে, বলে : এখন সাড়ে এগারোটা ; দেড়টার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা

এই টেবিলে এনে রাখা হলে তবেই ডায়রীর পাতা ছেঁড়া যাবে; বড্ড শক্ত পাতা কিনা—

মণিমালার কাকা বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে মাথা নিচু করে।

ইতোমধ্যে শঙ্কর বড়ুয়াকে ডেকেছেন ঘরের মধ্যে ব্রজ দত্ত। ডেকে জিজ্ঞেস করেছেন শঙ্করও এমামলা মেটাতে চায়, না, আদালত পর্য্যন্ত যেতে চায় মণিমালার কাকার সঙ্গে শেষ নিস্পত্তির কারণে। শঙ্কর ততক্ষণে খানিকটা আলো দেখছে; সে পালটা জিজ্ঞেস করে: মামলা মিটোতে আপনার ফি কত? ব্রজ দত্ত এতক্ষণে হাসেন: সাধারণতঃ হাজার টাকা চার্জ করি; তবে তোমার কেস আলাদা—। শঙ্করও হাসে: আমার কেস আলাদা কেন? ব্রজদত্ত প্রত্যুত্তর করেন একটু ভেবে: তুমি এই মেয়েটিকে সব জেনে বিবাহ করে তোমার যে পরিচয় দিয়েছে তা আমাদের দেশে তথাকথিত গেরুয়াধারী মাত্রেই যারা মহাপুরুষ বনে যায় তাদের চেয়ে অনেক বেশি মহত্ত্বের; তাই—। তারপর হরিপদদের দিকে অঙ্গুলিসংকেতে বিপদ বিস্তৃত হন: এদের মতো বয়েস এবং সেন্টিমেণ্টসর্বস্ব হলে অবশ্য হয়তো টাকাই চাইতে পারতাম না; কিন্তু আমি জানি অচলটাকা চললেও এজগতে, সেন্টিমেণ্ট সেলডাম পেস। শঙ্কর বড়ুয়া পার্স বার করে: কত দেব? তুমি পাঁচশো দাও; বাকী পাঁচশো তোমাদের বিবাহে আমার যৌতুক। ব্রজ দত্ত সেন্স অভ হিউমারের এই সামান্য টাচ দেওয়ায় বোধ হয় উৎকোচ দান ও গ্রহণের মতো নীরস বাস্তবও সেদিন কিঞ্চিৎ সরস ও সতেজ হয়ে ওঠে। পাঁচ খানা একশো টাকার নোট টেবলের ওপর রাখে বড়ুয়া। টেবলের ওপরই পড়ে থাকে পাঁচখানা নোট; টেবলের ওপরই পড়ে থাকবে অনেক্ষণ জানতো সবান্ধব হরিপদ; ব্রজ দত্ত ঘুসের টাকা হাত দিয়ে ছোঁন না।

হরিপদর মনে পড়েছে জগৎলালের ডায়েরীতে নেই এমন দুটি কথা আজ, তারমধ্যে একটি ব্রজ দত্তর উক্তি; ব্রজ দত্ত বলেছিলেন;

ঘুস নেওয়ার চেয়ে খারাপ কিছু নেই জানি; তবু ঘুস নিই কেন জানো? টাকার জন্যে। এত টাকা চাই কেন জানো? ছেলের জন্যে! ছেলেকেও যাতে এই ঘুস নিতে না হয় কোনও দিন; শুধু এই কারণে—

হরিপদর কাছে আজও ক্লিয়ার নূন পুরো; ব্রজ দত্তকে ঘুসখোর বলা যায়; ঠিকই। কিন্তু এই উৎকোচ গ্রহন যতদূর দোষের কাজ ততদূর প্রশংসার যোগ্য কি না এর উদ্দেশ্যে কে বলবে।

আর একটা প্রশ্নের মীমাংসা অবশ্য সেদিনই হয়ে গিয়েছিলো। মহৎ অন্তঃকরণ কেবল বৈরাগ্য সাধনের মধ্যেই নেই; অনুরাগ আরাধনের মধ্যেও নিশ্চয়ই আছে।

মণিমালার কাকা দুঘণ্টার অনেক আগেই ফিরে আসে। ব্রজ দত্ত রেহাই দেবার আগে জিজ্ঞেস করেন: যে প্রিয়পাত্র আপনার এই সর্বনাশের মূলে সে ছোকরার নাম ধাম কি?

আজ এত বছর বাদে ডায়রী পড়তে পড়তে মনে পড়ে যায় হরিপদ দাস শর্মার। এই ডায়রী যার,—সেদিন মণিমালার কাকা তার নামই বলেছিলো: জগৎলাল মিত্তির।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এক

অনেক রাত পর্যন্ত সেদিন বাড়ি ফেরেনি যজ্ঞেশ্বর রায়। শশিকলা বেশ একটু উদ্বিগ্ন বোধ করছিলো। ইদানীং তার স্বামীর বাড়ি ফেরার টাইম প্রায় সুনির্দিষ্ট হয়ে এসেছিলো। আগেকার কাল হলে বিন্দুমাত্র বিচলিত হতো না শশিকলা; কারণ তখন কি অবস্থায় মত্তপ যজ্ঞেশ্বর ফিরবে তা যেমন অনিশ্চিত ছিলো, তেমনই কখন ফিরবে ঠিক ছিলো না তারও। এখন অনেকদিন ধরেই তার স্বামী যে কেবল মদ ছেড়েছে তাই নয়, দেরী করে বাড়ি ফেরাও দিয়েছে ছেড়ে। তাইতেই শশির মন আজ ঈষৎ ভাবাক্রান্ত। কেবল আশার কথা এর মধ্যে এইটুকু যে থেকে থেকেই বাঁ চোখের পাতা নাচছে সকাল থেকে। এটা আশার না তামাশার কথা ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছে না যখন বিরাট এক সাদা রং ঝকঝকে গাড়ি স্ট্রেট ফ্রম কার উইণ্ডো, এসে দাঁড়ালো বাড়ির দরজায়। জানালার ফাঁক দিয়ে তাই দেখেই চমকে উঠলো শশিকলা। স্বর্ণদেবের কথা কেন কে জানে, মনে পড়লো। প্রথম দিন অবশ্য স্বর্ণ ট্যাক্সিতে এসেছিলো; তাহলেও এত বড় গাড়িতে এক স্বর্ণদেবই আসতে পারে এত ছোট গলিতে। যদি স্বর্ণদেব হয়,—মনে মনে আকুল হয়ে ভগবানকে স্মরণ করে শশিকলা। কিন্তু না; স্বর্ণদেব নয়। গাড়ি থেকে নেমে এল যজ্ঞেশ্বর রায়। ভালো কবে চোখ মুছলো বেশ দু'চারবার শশিকলা। জেগে-জেগেই স্বপ্ন দেখছে না তো সে।

যজ্ঞেশ্বর গাড়ি-থেকে নামবার আগেই বেরুবার দরজা খোলবার

জন্যে এসে দাঁড়ায় লেভারিড ড্রাইভার। দরজা খুলে দিতে যজ্ঞেশ্বর এসে দাঁড়ায়। কিন্তু চলতে পারে না; টলে। আবার অনেক দিন বাদে তার স্বামী মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরছে। তাতে যতটা অবাক হবার তার চেয়ে অনেক বেশি হতবাক হয়েছে শশিকলা যজ্ঞেশ্বরকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে। গাড়িটা কার? গাড়ি যদি অন্য কারুর হয় তো তার ড্রাইভার অমনভাবে গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে দাঁড়াবে কেন। ভাবনার মীমাংসা হয় না; তার আগেই ম্যাজিকের পরের আইটেমের মতই ঘটে যায় আরও অদ্ভুত আরও অবিশ্বাস্য ভোজবাজি। গাড়ির পেছনের গহ্বরের মুখ খুলে ড্রাইভার নিয়ে আসে থরে থরে সাজানো কতরকম বাক্স প্যাকেট; আরও কত কি! এসে ঢোকে যজ্ঞেশ্বরের বাড়িতেই। যজ্ঞেশ্বর টলতে টলতে এসে তখন সবে বসেছে বাইরের ঘরে ইজিচেয়ারে। কোনও রকমে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে ঃ ছেলেমেয়েদের ডাকো—

ছেলেমেয়েদের বেশি ডাকতে হয় না; তারা উঠে বসেছে হৈ-চৈতে। হৈ-চৈ আরম্ভ হয়ে গেছিলো তার আগেই পূর্ণ চৌধুরীর গলিতে ততক্ষণে। প্রথমে একটি কি দুটি জানলা খুলে বেরিয়ে আসে এক কি দুচার জোড়া চোখ। তারপর আস্তে আস্তে রাস্তায় জমতে থাকে ভীড়। থতমত খেয়ে গেছে সবাই। যজ্ঞেশ্বর রায়ের এই পরিবর্তন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না; অথচ পারিপার্শ্বিকে যেন তারই আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অনেকদিনই এর আগে রাতের ঘুম নষ্ট করেছে যজ্ঞেশ্বর, তার মাতলামীতে, এগলির। আজকে তাদের সারা রাতের ঘুম নষ্ট করবে এমন করে যজ্ঞেশ্বর,—এ তাদের কাছে আরব্যোপন্যাসের এক হাজার এক রাতের চেয়েও বিস্ময়কর আরেক বিনিদ্র রাত। ভাবাবার চেষ্টা করে তারা, আজ কার মুখ দেখে তারা উঠেছে সকালে। যজ্ঞেশ্বরের সমৃদ্ধিতে তাদের কারুর ক্ষতি বৃদ্ধি নেই; তবুও তাদের দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছু বলে একে মেনে নিতে অথবা মনে নিতে

চায় না। এই একটি জায়গায়,—নিজের নাক কেটেও পরের জয়যাত্রা ভঙ্গ করবার দুর্নিবার প্রার্থনার ক্ষেত্রে সব বাঙালীই এক। সে বাঙালী রাসেল স্ট্রীট, থিয়েটার রোডে বাস করুক অথবা উপবাস করুক পাঁচু খানসামা লেন কি পূর্ণ চৌধুরীর গলিতে। বাঙালীর শ্রীবৃদ্ধিতে বাঙালী যত দুঃখ পায় এমন কাতর নয় কোনও অবাঙালীও। এবং এই কারণেই অবাঙালীদের জায়গায় বাঙালীর যত সুবিধে কমে যায় দিনে দিনে; বাঙালাদেশে সব চেয়ে অসুবিধের মধ্যে যে বাস করে না, উপবাস করে,—তারই নাম বাঙালী।

ছেলেমেয়েদের বলে যজ্ঞেশ্বর : যা দেখে আয়,—তোদের গাড়ি।

জিনিষপত্তরে ভরে যায় ঘর। দাঁড়াবার জায়গা পাওয়া শক্ত হয়। তারপরে এক সময়ে রাত বাড়ে। যে যার ফিরে যায় বিজন ঘরে শূন্য রাতে। বাড়িতে জায়গার তুলনায় লোক বেশি হলেও, পূর্ণ চৌধুরীর গলিতে প্রতিবেশী ঘরের ছপপড় ফুড়ে লক্ষ্মীর এই সমারোহময় আবির্ভাবের পর, অতঃপর তাদের ঘর নির্জন এবং রাত শূন্য। এক সময়ে ছেলেমেয়েরাও উঠে গেলো নিজেদের ঘরে। তারাও অবশ্য ঘুমোতে পারবে না সারা রাত। সকাল হবে কখন ; কখন নিজেদের গাড়ি করে প্রথম যাবে স্কুলে সেই উত্তেজনায় বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে করতে শেষ পর্যন্ত ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়বে ভোররাতে। উঠতে দেরী হয়ে যাবে ; হায় হায় করতে করতে দুধ না খেয়েই দৌড়বে রাস্তায় ; গাড়ি কোথায়,—না দেখতে পেয়ে ভাববে সবটাই স্বপ্ন দেখেছে তাই ডবল হতাশায় ভেঙ্গে পড়বে তাদের কচি মন। আর হয়ত তখনই গলিতে হর্ণ দিতে দিতে ঢুকবে নতুন গাড়ি। নতুন গাড়ি নয় কেবল ; নতুন ড্রাইভারও তার এসে হেসে দাড়াবে। খুলে দেবে দরজা। বলবে : বেড়িয়ে আসবে—

রাত অনেক হলে শশিকলা আর যজ্ঞেশ্বর অনেক দিন বাদে

ডুজনে একলা হয়। যজ্ঞেশ্বর বার করে কোথা থেকে, কত জায়গা থেকে, শশীর বলা অথবা গোনা অসম্ভব, টাকা, গাদা গাদা টাকা। থাক্ থাক্ টাকা। থরে থরে; থোকো থোকো। মিষ্টির থালার মতো সুইটমিট শপে; বাগানে ফুটে থাকা ফুলের মতো। সব তুলে দেয় শশীর হাতে। হাত ধরে না; আঁচলেও না। মাটিতে উপচে পড়ে। উড়তে থাকে ঘরময়। টাকা গুছিয়ে তোলে যখন, তখন যজ্ঞেশ্বরের চৈতন্য লুপ্ত হয়ে গেছে।

টাকা; এত টাকা,—কোথা থেকে এলো তার স্বামীর মুঠোয়? —দারুন ভয় হলো শশিকলার। কেন, সে জানেনা আবার স্বর্ণদেবের চেহারা এসে দাঁড়ায় তার সামনে। চীৎকার করে উঠলো শশী: না; না। স্বর্ণদেব বেঁচে আছে; স্বর্ণ বেঁচে আছে। এটাকার সঙ্গে তার নিরুদ্দেশ হবার কোনও সম্পর্ক নেই।

চীৎকারে ঘুম ভাঙ্গে যজ্ঞেশ্বরের। ডুজনের চোখ ডুজনের চোখকে মিট করে। স্বর্ণদেব এসে দাঁড়ায় ডুজনের চোখের মাঝখানে।

দুই

রোম নগরী একদিনে তৈরী হয়নি,—এমন কথা ইতিহাসে লেখে। যজ্ঞেশ্বর রায়ের পরিবর্তনের ইতিহাস লেখা হলে এ ইতিহাস লেখা হতো না। কারণ,—পুরাণো বাড়ির পাশের ফাঁকা মাঠের ওপর ইন্দ্রপ্রস্থ নির্মিত হলো,—নিশ্চয়ই একদিনে হলো না, ঠিকই; কিন্তু প্রতিবেশীদের মনে হলো কয়েকঘণ্টার মধ্যে কিছুনা-র সমুদ্রের অতল থেকে উঠে এসেছে যক্ষপুরী। গাড়ি হলো; বাড়ি হলো। ছেলে গেল গোয়ালিয়রের পাবলিক স্কুলে; মেয়ে কনভেণ্টে। চাকর গেল বেয়ারা এল। ঠাকুরের বদলে বাবুর্চি। ভুল বললাম; ঠাকুর ছিলোই না। শশীই বউ এবং ঠাকুর ছিলো

একসঙ্গে। খারাপের মধ্যে,—যজ্ঞেশ্বরের চাকরি গেলো। অবশ্য খারাপ হলো, না বলে, ভালো হলোই বলাই সঙ্গত হয়। কারণ, যজ্ঞেশ্বর যে চিঠি চুরি করার ফলে তার এই আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ হাতে আসা সেই চিঠি চুরির অপরাধে কারাদণ্ড অনিবার্য ছিলো। এবং চুরি প্রমাণ করা এমন কিছু অসম্ভব ছিলো না। কিন্তু যজ্ঞেশ্বরের তখন একাদশে বৃহস্পতি;—তার 'ফলে যজ্ঞেশ্বরকে বাঁচাবার নিমিত্ত কারণ হলো অফিসের ছোট সাহেব। যজ্ঞেশ্বর মোদো, ধেরো যাই হোক, অত্যন্ত কর্মঠ, সৎ, লয়াল কর্মচারী ছিলো। তার পুরস্কার অথবা কুষ্ঠির প্রাপ্য হিসেবে, —যজ্ঞেশ্বর বেঁচে গেলো আদালতে যাবার হাত থেকে।

শেয়ার-প্রতিষ্ঠানের চাকরি ছাড়বার পর যজ্ঞেশ্বর রায়ের ভাগ্যের চাকা আরও জোর ঘুবতে লাগলো। ভালোর থেকে আরও ভালোর দিকে। হাতে টাকা আসতে মাতাল হওয়া সত্বেও বুদ্ধিমান যজ্ঞেশ্বরের বুদ্ধি খুলে গেলো অনেক বেশি। বাড়ি করলে খুব চটপট আরও কয়েকখানা। সেগুলোয় ভাড়াটে বসালে, কেবল মাত্র সরকারী কর্মচারী ভাড়াটে। শহরতলীতে একখানা এবং মফঃস্বলে আরেকখানা সিনেমা-হাউস লিজ নিলে। একখানা বাসের লাইসেন্স জোগাড় কবল; একখানা ট্যাক্সির। কিন্তু সব চেয়ে বুদ্ধির পরিচয় দিলো শেয়ার-বাজারের ছায়া না মাড়িয়ে আর। কত দালাল এলো; কত দালাল গেলো। একখানা শেয়ারও গচাতে পারলো না কেউ যজ্ঞেশ্বর রায়কে আর। গিল্ট-এজেড শেয়ারও নয়। অন্য যে কোনও লোক হলে আরও লোভে, আরও ফাটকার ফাঁদে পা দিতো; এবং সেই পাপে হতো অবধারিত মৃত্যু। যেমন হয়েছে ফাটকায় হঠাৎ বড় লোকদের বেলায় কতবার; এবং যেমন অসম্ভব নয় সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির ভবিষ্যতে আরও অনেক বার।

কিন্তু তীর এলো সম্পূর্ণ অন্য দিক থেকে।

এতদিন কেবল মদ ছিল; এতদিনে তার সঙ্গে দেখা দিলো একটি মেয়েমানুষ। অসাধারণ রূপসী; আর অসম্ভব কম বয়সী। মাথা ঘুরিয়ে দেওয়ায় মতো চেহারায় উত্তেজক কণ্ঠস্বরে অনিবার্য অধঃপাতের রাস্তা নিজে এসে আমন্ত্রণ জানালো যজ্ঞেশ্বরকে। স্বর নয়; কণ্ঠে কারুর সেই পুষ্পশর থাকে যা দিয়ে পুরুষ হৃদয় রমনীয় ছিন্নভিন্ন হয়েছে কতবার, তার এই প্রথম অভিজ্ঞতা হলো এমন একজনের যে কেবল দেহে প্রৌঢ় নয় মনের দিক থেকেও অনেক আগেই বিগত যৌবন এক পুরুষ। আশ্চর্য হবার নেই এতে; এমনই হয়। দাঁত চলে গেলে তবেই দাঁতের মর্ম অবগত হয় লোকে; মন গেলে তবেই মনের ক্ষুধা বাড়ে লোকের এবং স্ত্রীলোকের। চল্লিশ থেকে প্রৌঢ়ত্ব অতিক্রান্ত না হবার বয়স তক মেয়েরা যার মধ্যে দিয়ে যায় তাকেই পশ্চিমের ভাষায় বলা হয়ে থাকে: ডেঞ্জারাস এজ। পুরুষের বেলায় শক্তিহীন হতে থাকে সে যত, অক্ষম পৌরুষের অর্থহীন দম্ভে তত ডেঞ্জরাস হবার বিকৃত চেষ্টার দুর্দিন আসে, দেখা দেয় পার্ভাসান।

যজ্ঞেশ্বর রায়ের বেলাতেই বা তার ব্যাতিক্রম হবে কেন? একটা পার্টিতে দেখা হয়ে গেলো সেই উর্বশীর সঙ্গে। পাশাপাশি বসেছিলো দুজন। নিজে থেকেই যেচে কথারম্ভ করেছিলো সেই অপরূপা। পার্টির শেষে এতদূর অন্তবঙ্গতার জন্ম হলো যে পার্টিতে যারা লেট-কামার তারা মনে করলো দুজনে বুঝি এক সঙ্গে এসেছে। পার্টিথেকে বেরিয়ে বাড়ি গেল না কেউ; না যজ্ঞেশ্বর; না সেই তরুনী।

মেয়েটি তার যা নাম বলেছিলো যজ্ঞেশ্বরকে, সেটি তার আসল নাম নয়। মেয়েটির হঠাৎ এই অন্তরঙ্গতার পেছনে উদ্দেশ্য ছিলো। সুদ্দর সিঙ্গাপুর থেকে তাকে আনিয়েছিলেন কলকাতা পুলিশের বিচক্ষণতম কর্মচারী: হরিপদ দাশশর্মা। মেয়েটির নাম: চামেলী বড়ুয়া

জগৎলালের ডায়েরী পড়েই প্রথম এ মতলব মাথায় আসে হরিপদর। তার সন্দেহ দৃঢ়তর হয় যে স্বর্ণদেব নিহত বা নিরুদ্দিষ্ট যা-ই হোক। যজ্ঞেশ্বর রায়ের বাড়িতেই অথবা বাড়িথেকেই হয়েছে। হোটেলে সে রাতে ফিরে যেতে পারেনি স্বর্ণদেব সরকার। চামেলীর সঙ্গে স্বর্ণদেবের প্রণয়ে খাদ ছিলো না যে তা ঘাগু পুলিশের সন্দিগ্ধ চোখেও ধরা পড়েছে। চামেলীকে যজ্ঞেশ্বর দেখেনি কখনও। যজ্ঞেশ্বরের পয়সা হয়েছে; মদ তো আছেই; একটি মেয়ে ঘনিষ্ঠ হলে তার কাছে হড় হড় করে সব বলে ফেলতেও পারে যজ্ঞেশ্বর,—এই আন্দাজেই ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছিলেন হরিপদ।

চামেলীকে রাজি করতেও বেগ পেতে হয়নি। স্বর্ণদেবকে কে সরিয়ে ফেলেছে তা বার করায় তার স্বার্থ এবং আন্তরিকতা স্বর্ণর আপনজনের চেয়ে কম নয় চামেলীর। রূপ এবং বুদ্ধির সোনায় সোহাগা হয়েছিলো তদুপরি তার ক্ষেত্রে। দুটোকেই কাজে লাগাতে দ্বিধা করলো না সে। অল্পদিনের মধ্যেই মাখামাখি এমন স্তরে গিয়ে পৌঁছল যে যজ্ঞেশ্বর বাড়ির আনাচ-কানাচ পর্যন্ত মুখস্থ হয়ে গেল চামেলীর। শশিকলা দেখে গেল চুপ করে সব। এতদিনে তার যা হয়নি এতদিনে তাই হলো। দুঃখের বরষায় যেদিন চক্ষের জলে নেমেছিলো সেদিনও স্বামীর জীবনে সেই ছিলো একমাত্র রমণী; আজ পূর্ণিমার সচ্ছল চাঁদ হেসে উঠেছে যাবার বেলায়,—তবু আজ তার চেয়ে দুঃখী আর কেউ নেই। স্বামীকে দেখলেই তার খাক হয়ে যাওয়া ভিতরটা দুহাতে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইতো যজ্ঞেশ্বরকে। নিরন্তর মনের সঙ্গে লড়াই করতে করতে শরীর ভেঙ্গে পড়লো শশীর।

তাকে সেবা করবার অছিলায় চামেলী পাকাপোক্ত ভাবে রয়ে গেল যজ্ঞেশ্বরের নতুন বাড়িতে।

তিন

জগৎলালের ডায়েরী থেকে জানা যায় মণিমালা একমাত্র মেয়ে চামেলীকে তুলে দিতে চায় সিংঙ্গাপুরের এক ধনী দুশ্চরিত্রর হাতে। এই পাত্রটির পয়সা আসে আফিং কোকেনের চোরাকারবার থেকে। পৃথিবী জুড়ে এর কারবার; পয়সা কুবেরেরও ঈর্ষ্যাযোগ্য। পুরো নাম জানা নেই কারুরই; কারণ মণিমালার নির্বাচিত হবু জামাই পুরী স্বনামধন্য নয়; পদবীধন্য পুরুষ। চামেলী যাকে বিয়ে করতে চায় তার নাম স্বর্ণদেব সরকার। মণিমালা যার হাতে তুলে দিতে চায় তার পদবী পুরী; তার নামে কিছু এসে যায় না, কারণ তার টাকার শেষ নেই। কিন্তু কেবল টাকাই এর কারণ নয়; কারণ স্বর্ণদেব পুরীর তুলনায় কিছু না হলেও মণিমালার তুলনায় রীতিমত ধনী। আসল ব্যপার হচ্ছে এই যে চামেলী হবার পর দারুণ পরিবর্তন হয় যার তারই নাম মণিমালা। শঙ্কর তাকে কাশীতে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করবার সময়ে সে যা ছিলো চামেলী বড় হবার পর সে আর তা নেই। চামেলী বড় হবার বাড়বার সময়ে মণিমালা বদলেছে আস্তে আস্তে; গুটিছেড়ে বেরিয়ে এসেছে প্রজাপতি। কারণ শঙ্কর একদিন যেমন তাকে অশেষ লজ্জার হাত থেকে উদ্ধার করে আর একদিন তেমনই অশেষ অসহায়তার মধ্যে ফেলে রেখে চলে যায়। বিবাহের পরে মণিমালার কাকা মামলা তুলে নিতে বাধ্য হন বটে কিন্তু শঙ্করের বাড়ীতে ব্যাপারটা জানাজানি হবার পর নিদারুন গোলমাল হয়। শঙ্করের কাছেও আস্তে আস্তে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যালোকের মত অঙ্গ থেকে মাধুরীর বদলে উত্তাপ বাড়তে থাকে যেমন, তেমনই আদর্শের উত্তেজনার চেয়ে অনুতাপের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। হট করে

বিয়ে করা বসাটা যে হঠকারিতা হয়েছে। বুঝতে পারে সে। কিন্তু মণিমালা তখন তাকে ঘিরে স্বপ্নের জাল বুনতে সুরু করে দিয়েছে, ধন নয়, মান নয়, এতটুক বাসা অনেকখানি ভালোবাসা দিয়ে গড়ার চিরন্তন স্বপ্নে আত্মবিস্মৃত সেদিন মণিমালা এই নির্জলা সত্য যে, তার পেটে এসেছে যে ইতিমধ্যে, আর ক'দিন বাদেই যে আসবে বাইরের আলোয়, সে তার বিবাহপরবর্তী সন্তান নয়; জন্ম নয় তার স্বামীর ঔরসে।

দোটানার মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগলো শঙ্কর। ইতোমধ্যে কি করবে ভাবতে ভাবতে পৃথিবীতে এসে পৌঁছল চামেলীর গন্ধ। আরও একবছর বাদে চামেলীর পদবী যখন মণিমালা, 'বড়ুয়া'-ই রাখবে বলে বদ্ধপরিকর তখন তারই ছুতো করে প্রথম তার দীর্ঘদিন ধরে লালিত মানসিক যন্ত্রনাকে ব্যক্ত করলো শঙ্কর। সে যন্ত্রনার কাতর আর্তনাদে স্বপ্নভঙ্গ হলো মণিমালার। জেগে উঠে সে দেখলো এ জগৎ স্বপ্ন নয়। শঙ্কর বললো এই প্রথম ঈষৎ রূঢ়, উত্তপ্ত স্বরে: তুমি ওর নাম যা খুসি তাই রাখতে পারো; কিন্তু ওর পদবী বড়ুয়া রাখা চলবে না। মণিমালা সাজাচ্ছিলো চামেলীকে; একটু অবাক কণ্ঠে বোকা বোকা প্রশ্ন করলো: কেন? শঙ্কর কি ভাবলো; তারপর নরম গলায় পাল্টা জিজ্ঞেস করলো: কেন, তা কি তুমি জানো না?

মুহূর্তের মধ্যে অগস্তের মতো এই ছোট্ট একফালি সংলাপ শুষে নিলো মণিমালার উর্বশী আনন থেকে সব, রক্ত। মড়ার মতো ভাবলেশহীন; বিধবা দেওয়ালের মতো সাদা। অনেকদিন ধরে প্রভুর কাছে আদর পেতে অভ্যস্ত প্রভুভক্ত জীব যদি আচমকা লাথি খায় তাহলে যেমন কিছুক্ষণ যন্ত্রণায় কেঁউ কেঁউ করতে পর্যন্ত ভুলে যায় বুঝতে না পেরে এই আঘাতের অর্থ অথবা স্বম্পূর্ণ তাৎপর্য তেমনই বোবা মেরে গেল মণিমালা। তার চৈতন্য অসাড় হলো। সে, শঙ্কর কি বলছে, তার গতি লক্ষ্য করতে না পেরে কিংকর্তব্য

বিমূঢ় হলো। দারুণ আঘাতে সব কটি বুকের তার মোচড় দিয়ে উঠলো; তবু আওয়াজ বেরুলোনা মুখ দিয়ে বহুক্ষণ।

আস্তে আস্তে সমস্ত অতীত ঘটনায় প্রিসি করতে বসলো সে মনে-মনে। ভেবে পেল না কিছুতেই, কেন তবে শঙ্কর একদিন স্বেচ্ছায় রাজি হয়েছিলো পরের পাপের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিতে। কেন সেদিন সমাজ সংসার সব তুচ্ছ করে তাহলে পালাতে গিয়েছিলো মণিমালাকে নিয়ে কাশীতে। শুধু পালাতে নয়; সন্তানসম্ভবা কুমাবীকে বিবাহ পর্যন্ত কবতে হয়েছিলো দুঃসাহসী। শুধু তাইবা কেন। থানায় গিয়ে সমস্ত সিটুয়েশান ফেস করবার পৌরুষ কোথায পেয়েছিলো খুঁজে সেদিন শঙ্কব বড়ুযা। এবং তারপরেও দুজনে মিলে গড়ে তোলবাব একটি শান্তির নীড় পেয়েছিল কাব কাছে প্রেবণা। সেইটেই সত্য,—না, আজকের এই, চামেলীব পদবী বড়ুয়া বাখতেই তার এই সোচ্চাব আপত্তি,—এইটেই সত্য কে বলবে।

মণিমালা অবশ্য অনায়াসে, গায়ের সব ধুলো যেমন এক ঝটকায় টেনে নেয় লাইফবয় সাবানে,—তেমনই সব লজ্জা নিজের গায়ে মেখে নেয়; চামেলীর পদবী হয় জগৎলালের কথা মনে করে মিত্র রাখতে পারতো, আর নয় পারতো নিজের পদবী দান করতে নিজের আত্মজাকে। তাই কর'তো আগে হলে; কিন্তু মণিমালা তা কবলো না। কাবণ ওই একটি কথাতেই শঙ্করের সর্পিনীর মাথায় পা পড়ে গেছে; ফোঁস করে উঠেছে, বাচ্চাকে সমস্ত লজ্জা আব আঘাত থেকে আড়াল করবার কারণে; ফণা তুলেছে মণিমালা। সে বুঝেছে তার ঘর আবার নতুন করে ভাঙবার সময় হয়েছে নিকট। তাই সব চেয়ে নিকটের যে মানুষ তার দূরে চলে যাবার দুর্দিন হয়েছে সমাগত প্রায়। নারীর যা সব চেয়ে বড় অস্ত্র, সেই ইনটুশান দিয়ে সে বুঝেছে শঙ্করকে বাঁধা যাবে না আর ধরে। আইনের ভয় অথবা ক্রন্দনের রজ্জু দিয়ে বাঁধবার না আর যাযাবর হাঁসকে। তার সময়

হয়েছে যাবার। আজ পদবী পরিবর্তিত করলেও, তুদিন বাদে আবার নতুন অজুহাত দেখিয়ে কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে বসবে শঙ্কর। তাই মণিমালা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলো, চামেলীর পদবী বড়ুয়াই হবে; তাতে তার যাই হোক ক্ষতি।

মণিমালা তাই শঙ্করের চেয়েও অন্বর্থক কণ্ঠে বললো: আমি জানি; তুমিই জানো না কেবল যে এই মেয়ের পিতা যে তার চেয়ে সে আজ অনেক বেশি তোমার হয়ে উঠেছে; যে জন্ম দেয় সে যেমন কখনও কখনও মা হয়েও মা হয়না। তেমনই যে এই মেয়ের আমার গর্ভে আসবার কারণ তার পদবীতে তার সন্তানকে চিহ্নিত করবার মতো পৌরুষের পরিচয় সে দেয়নি; আর তুমি তার কারণ না হয়েও আমার এবং তার ঔরসে জাতর সমস্ত লজ্জা এবং অপমান নিজের মাথায় তুলে নেওয়ার পৌরুষ দেখিয়েছ বলেই তোমার পরিচয়ে তার পরিচয় হোক, এই চেয়েছিলাম আমি। নাহলে আমার চেয়ে বেশি আর জানে কে যে বড়ুয়া বলে পরিচিত হবার ওর কোনও পরিচয়পত্র ছিলো না জন্মমুহূর্তের অনেক আগে থেকেই।

শঙ্কর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার মধ্যেই তাকে সেচ্ছায় ছাড়পত্র দিতে বললো: চামেলীর পদবী বড়ুয়াই থাকবে জেনো।

শঙ্কর তাই-ই চাইছিলো। সে নিঃশব্দে চলে গেল মণিমালার জীবন থেকে, যেমন নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলো একদিন। মণিমালা বদলে আস্তে আস্তে। তুজনে পুরুষই খেলার শেষে মাটির পাত্রের মতো তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার পর সে আর কোনও পুরুষকে ভালোবাসতে পারেনি; ছলনা করতে শিখেছে। ঠিক সেই সময়েই জগৎলাল এসে দাঁড়ালো মণিমালা দরজায়। জগৎলাল অনেকদিন ধরেই আসব করেও, আসতে সাহস করেনি, নিদারুণ অন্তর্দাহে সে পুড়ে যাচ্ছিলো। শঙ্কর থানায় যাবার পর

যখন জগৎলাল জানতে পারলো যে তার অন্যায়ের দাম দিতে যথা সর্বস্ব রিস্ক করেছে আরেকজন নিরপরাধ তখন নিজের ওপর তার অসম্ভব ঘৃণা হলো। আর নিজের সন্তানকে অন্যলোককে পিতা বলে জানবে, অন্য একজনকে ডাকবে বাবা বলে এটাতে তার কোথায় আঘাত করছিলো প্রচণ্ডভাবে। তারপর যখন শঙ্কর বেরিয়ে গেল মণিমালার দরজা থেকে তখনও ভয় পাচ্ছিলো মণিমালার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে; যদি মণিমালা অপমান করে। শেষ পর্যন্ত একসময়ে অবশ্য মণিমালার সব অপমান সহ্য করেও সে দেখা করবেই একবার তার সন্তানের সঙ্গে এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে গেল মণিমালার বাড়ি। গিয়ে অবাক হলো; মণিমালা তাকে থুথু দেব'র বদলে স্বাগত জানালো। মেয়েকে এগিয়ে দিলো আদর করতে। থেকে যেতে বলতে বললো সেখানে কয়েকদিন। জগৎলাল কয়েকদিনের জন্যে নয়; রীতিমতো থেকে গেলো মণিমালার বাড়িতে। চামেলী বড়ুয়া জগৎলালকেই বাবা বলে ডাকতে শিখলো।

আসলে মণিমালার সেদিন একজনকে প্রয়োজন ছিলো। প্রয়োজন ছিলো একজন পুরুষের; সামাজিক মর্যাদা রক্ষার প্রশ্ন। জগৎলাল সেদিক থেকে একজন-এর চেয়ে একটু বেশিই যে তার জীবনে বটে তবে যে কোনও একজন হলেই চলে যেত মণিমালার সেদিন। চলে যেত কারণ মণিমালা তখণ আর সলজ্জ নববধুর ভূমিকায় নেই; জগৎকে সে চিনেছে। জেনেছ, প্রেম ভালোবাসা, হৃদয়। সব ধোঁকা। সব ফাঁকি। সত্য শুধু, রূপ; আর রূপো। মেয়েমানুষের যা কিছু আকর্ষণ তার মূলে ওই রূপ; পুরুষ মানুষের যা কিছু পৌরুষ, তা ওই রূপোয়। রূপ দিয়ে সে রূপো তুলবে ঘরে; মেয়েমানুষের যা সব চেয়ে বড় সম্বল তাই দিয়ে পৌরুষকে দিনে দিনে নিসম্বল করবে সে। জগৎলালকে, বাবা বলতে শেখালো বটে চামেলীকে, নিজের বাড়িতেও গৃহকর্তার

পজিসানও দিলো বটে কিন্তু তাকে করে রাখলো ল্যাপ ডগ; মাথায় উঠতে দিলো না আর। জগৎলালের কোনও দিনই ফিক্সড ইনকাম ছিলো না; হবার আশা অথবা প্রয়োজনীয় উৎসাহ তুইরই সম্ভাবনা ছিলো সুদূরপরাহত। তবুও; তুবেলা তু মুঠো খাবার জন্যে হয়ত সে এতটা মেনে নিতে পারত না; কিন্তু মেনে নিলো,—চামেলীকে তুবেলা দেখতে পাবে এই একমাত্র আশায়; চামেলী তাব সত্যিকারের বাপকেই বাপ বলে ডাকছে, জানছে, এই অসম্ভব সৌভাগ্যগর্বে।

আঠারো বছর বাদে পূর্ণ প্রস্ফুটিত হবার সময় হলো যখন চামেলীর তখনই সেই পদবীধন্য পুরুষ পুরীব প্রথম আবির্ভাব, মণিমালার জীবন-রঙ্গমঞ্চে। মণিমালার তখন যৌবন গেছে। ক্লান্ত সেই রমনী তখন চামেলীকে কারুর হাতে তুলে দিযে নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব এক্সিস্টেন্সে প্রস্থান করবার অপেক্ষায। পুরী তখন টকটকে যুবক। বিশ্বাসেব অযোগ্য বিত্তবান। নূতন উত্তেজনার আস্বাদ দিলো মণিমালাকে; মণিমালার যৌবনেব পড়ে আসা আলোর বিকেলে কোকেন; আফিং আর কদর্য কত কাববারের গোপন সুরঙ্গেব হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেল পুবী। ভাববার সময় ছিলো না; দাঁড়াবারও না। পাপের কারবারে বাধ্য হয়ে অংশীদার হলো মণিমালা। আরও অর্থের। আরও সামর্থ্যের নেশায় বুঁদ মণিমালা পুরীর হাতেই তুলে দিতে সঙ্কল্পিত হলো; সেও বাধ্য হয়ে; রাক্ষসের হাতে জেনে শুনে একমাত্র কন্যাকে তুলে দেবার মতো বিকৃত হয়নি নাহলে মণিমালা তখনও। কিন্তু বিপদ যেদিক থেকে আসবার আশা করেনি সে বিপদ এলো সেই দিক থেকেই।

পুরী মণিমালাকে তার আগেই তুলে নিয়ে গিয়েছিলো সিঙ্গাপুর। নতুন করে সংসার পাতবার সেই ছিলো সেদিন সব চেয়ে উপযুক্ত জায়গা। সেখানে কেউ চেনে না মণিমালা অথবা জগৎলালকে।

কোনওদিন প্রশ্ন উঠবে না সেখানে মণিমালার সঙ্গে জগৎলালের সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে। শঙ্করের সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠবে না কোনওদিন। চামেলী কেন বড়ুয়া জিজ্ঞেস করবে না কেউ। ভারী নিশ্চিন্ত বোধ করলো মণিমালা। কিন্তু সেই সুদূর সিঙ্গাপুরেই যা ঘটবার নয়, ঘটে গেল তাই। প্রথম প্রেম এলো বহুযুগের ওপার থেকে আষাঢ় আকাশ আলো করে; নীপবনে অকারণ পুলক সঞ্চার করে; চামেলীর যৌবনে এলো রোদনভরা বসন্তের রাত। বরিষণ মুখরিত সতেরটি শ্রাবণের রমনীয় রাত্রি অপেক্ষা করছে যে একটি হৃদয়ে ধারাজলে কান পেতে যে শুনেছে: বুঝি আসিছে সে। দিন চলে গেছে। তবু বসে থেকেছে চামেলী: যদিও বা নাহি আসে তবু বৃথা আশ্বাসে—ধূলির পরে পেতে রেখেছে প্রিয়র সঙ্গে প্রিয়া-মিলন প্রত্যাশার আসন।

ফাল্গুনে দেখা দিয়েছে সে বরষায় যার জন্যে অভিসারসাজে সেজেছিলো হৃদয়। জীবনযৌবন ধন্য করে এসে দাঁড়িয়েছে সে। বিবশ দিন আর বিরস কাজের মধ্যেই দেখা দিয়েছে প্রেম বিপুল সমারোহে। ফুটে উঠেছে চামেলী; রোদন ভরা বসন্তে হাওয়া দিলে সুবাসে ভরে দিয়েছে বিনিদ্র রাত্রির অন্ধকারে আরেক পুরুষের হৃদয়। নিঃসঙ্গ নির্জন গৃহকোন হয়েছে আলো। উপছে পড়েছে চামেলীর রূপ; আরও অপরূপ হয়েছে সে। ফিরে তাকাবার সময় হয়নি যখন মণিমালার নতুন নেশায় মাতার প্রথম দিকে তখনই ফুটেছে চামেলী আরেক পুরুষের মনের আঁধারে। তারই জন্যে উন্মুখ হয়েছে চামেলী। মণিমালা ভেবেছে, পুরীর জন্যে বুঝি। সেই ভেবেই নিশ্চিন্তে থেকেছে। ঘুম ভেঙ্গেছে যখন তার মেঘে মেঘে বেলা হ'য়ে গেছে অনেক। চামেলী তখন সম্পূর্ণ ভাবে বদ্ধপরিকর হয়েছে যে ঘরে বিবাহিত রমনী হতে তার নাম: স্বর্ণদেব সরকার।

স্বর্ণদেবর কথা শুনে মণিমালার মনে পড়ে গেছে নিজের কুমারী জীবনের প্রথম কান্না।

চার

ভয় পেলো মণিমালা স্পষ্ট দেখতে পেল তার অতীত ইতিহাসের নিষ্করুণ পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে তার মেয়ের জীবনে। চামেলীকে বোঝাবার চেষ্টা করলো। জগৎলালের এবং শঙ্করের প্রতারণার কাহিনী ছদ্মশ মাধ্যমে আবৃত্তি করলো মেয়ের কাছে। তাতেও ফল হলো না। কিছুতেই বোঝাতে না পেরে উড়ো চিঠি ছাড়তে লাগলো পুরীকে দিয়ে নিজের নামে স্বর্ণদেবদের বাড়িতে। স্বর্ণদেব চামেলীকে নিয়ে গেল স্বর্ণদেবের ওখানে। বাপ-মা দুজনেই চামেলীর চেহারা আর ব্যবহারে এমন অন্ধ হলেন যে কদর্য অভিযোগ সম্বলিত উড়ো চিঠিতেও এতটুকু বিচলিত বোধ করলেন না। শেষকালে নিজে গেল মণিমালা অন্য নামে অন্য পরিচয়ে স্বর্ণদেবের এবসেন্সে। বলে এলো উড়ো চিঠির সমস্ত অভিযোগ সত্য। সে তীরও যখন ব্যর্থ হলো মাছের চোখ বিঁধতে, তখন মণিমালা থ্রেট করে চিঠি দিলো ঃ অবিলম্বে চামেলীর আশা ত্যাগ না করলে স্বর্ণদেব সজ্ঘাতিক শারীরিক বিপদগ্রস্থ হবে। এই চিঠি দিয়েই জালে পা দিলো মণিমালা। স্বর্ণদেব ঠিক সেই সময়ই কলকাতায় গেলো এবং আর ফিরে এলো না হোটেল থেকে প্রথম দিনই ঝড়ের রাতে যজ্ঞেশ্বর রায়ের ঠিকনায় বেরিয়ে। এবং এই চিঠির সূত্র ধরেই হরিপদ সন্দেহের সার্চলাইট ফেললেন মণিমালার ওপর। স্বর্ণদেবের বাড়ির তখনও লোকেদেরও তখন ধারণা হয়েছে যে মণিমালা-পুরীই এই কাজ করিছে ; তবে স্বর্ণদেব নিহত হয়েছ এতদূর তখনও ভাবতে পারেননি তাঁরা; নিখোঁজ হয়েছে মাত্র এই সান্ত্বনার শব্দ তখনও কান পাতলে শোনা যাবে শশিকলার বেলফুল আর তার স্বামীর হৃৎপিণ্ডের ধ্বকধ্বক ধ্বনির সঙ্গে বাজতে ঐকতানে। চামেলী এই সময়ে মণিমালার সঙ্গে কলকাতায়।

মণিমালাকে না জানিয়ে জগৎলাল কলকাতায় এসেছে আগেই হরিপদর আহ্বানে। তার ধারণা যত কিছুরই মূলে পুরী। মণিমালা এসেছে কলকাতায় যাতে জগৎলাল মারফৎ কেঁচো খুঁড়তে সাপ না বেরিয়ে পড়ে অতীতের। স্বর্ণদেবের মামলা নিয়ে তার বিশেষ মাথা ব্যথা ছিলো না; কারণ স্বর্ণদেবকে গুম করবার অর্ডার দেবার আগেই স্বর্ণদের কলকাতায় চলে গিয়েছিলো। এক আধবার যে তার পুরীকে সন্দেহ হয়নি তা নয়; তবে পুরী যত ধুরন্ধরই হোক তার বাঁচবার এবং মরবার কলকাঠি তখন সম্পূর্ণ মণিমালার কবলে; তাই মণিমালা 'গো' না বলা পর্যন্ত এত বড় কাজে পুরী এগুবে মনে হয়নি মণিমালার।

চামেলীর মতে স্বর্ণদেব-মামলার আসামী পুরী ছাড়া কেউ নয়।

হরিপদর সঙ্গে গোপনে দেখা সাক্ষাতের ফলে হরিপদর মতলব মতই উদয় হয় হঠাৎ-ধনী প্রৌঢ় যজ্ঞেশ্বরের জীবনে। যজ্ঞেশ্বরের কাছে অশোকা মল্লিক বলে পরিচয় দেয় সে জীবনবীমার দালাল হিসেবে। তার ভায়ের নামে এজেন্সী নেওয়া আছে এই প্রিটেন্সে প্রবেশ করে যজ্ঞেশ্বরের বাড়িতে। একটা পার্টিতে আলাপ হয় যজ্ঞেশ্বরের সঙ্গে। আলাপটা যজ্ঞেশ্বরের কাছে এপিয়ার করে আনএকস্পেকটেড বলে। কিন্তু চামেলী সেখানে হরিপদর প্রিএ্যারেঞ্জড মতো যায়। অভিনয় আরম্ভ হয় সেখানেই। পার্টির শেষে কার্ড বার করে দেয় হঠাৎ-বড়লোক জে রয়। পয়সা হবার পর তার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। যজ্ঞেশ্বর রায় হয়েছে জে রয়; ধুতির বদলে ট্রাউজার; ট্রামবাসের বদলে গাড়ি। এতদিনেও যা বাকী ছিলো তাই সম্পূর্ণ হয় চামেলীর অশোকা মল্লিকার ছদ্মবেশ-প্রবেশে। নিজের স্ত্রীর জায়গা নেয় অন্য স্ত্রীলোক।

যজ্ঞেশ্বর রায় কার্ড দেবার পর ভুলে গিয়েছিলো অশোকা মল্লিক-বেশী চামেলী বড়ুয়ার কথা কমপ্লিটলি। তখন সত্যি সত্যি দারুণ ব্যবসা করছিলো নতুন বড়লোক জে রয়। একদিন সন্ধ্যে সাড়ে

সাত কি আটটায় একটা জরুরী ইমপর্টান্ট কনফারেন্সের পর একা বসে আছে যজ্ঞেশ্বর তার চেম্বারে; উঠবো-উঠবো করছে। এমন সময় দূর্ভাষযন্ত্রের ওপার থেকে ভেসে এলো রৌদ্ররুক্ষ দিনের শেষে মেঘলা কণ্ঠস্বর। আমি অশোকা মল্লিক—। সমস্ত দিনের ক্লান্তি মুছে দিলো সেই কণ্ঠস্বর মুহূর্তে; মেঘের তোয়ালে যেমন করে মুছে নেয় আলোর ঘাম আকাশের গা থেকে। উঠে বসলো জে রয় ওরফে যজ্ঞেশ্বর ঃ কি খবর? টেলিফোনের অপরপ্রান্ত জিজ্ঞেস করে ঃ একবার দেখা করা দরকার। যজ্ঞেশ্বর একটু ভেবে নিয়ে বলে ঃ কাল লাঞ্চ খাওয়া যেতে পারে একসঙ্গে। মনোঃপুত হয় না যেন পুরো রিসিভারধারিনীর ঃ আজ দেখা হয় না একবার? 'আজ?' চুক করে আওয়াজ হয় যজ্ঞেশ্বরের দিক থেকে ঃ আজ রাত হয়ে গেছে যে; কোথা থেকে কথা বলছেন আপনি? অশোকা ওরফে চামেলী বলে গ্রেট ইষ্টার্ণ থেকে; সেখানে যজ্ঞেশ্বর যদি "ডিনার করে আজ তাহলে খাওয়াও হয়; অশোকার কথাটাও বলা হয়"। আসন্ন রাত্রির উত্তেজনা মধুর সঙ্গের রমনীয় কল্পনায় ভিজে আসে প্রৌঢ় কণ্ঠ; তাই হবে; আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে আসছি।

গ্রেট ইস্টার্ণে ডিনারেই কথা শেষ হলো না অশোকার অথবা চামেলীর; সে একটা চাকরি চায়। আকাশ-পাতাল ভাবতে দেখে যজ্ঞেশ্বর রায়কে হেসে ফেলে অশোকা ঃ আপনি এমন ভাবে চিন্তিত হয়ে পড়বেন জানলে কথাটা পাড়তামই না আমি—না, না, নিদারুণ লজ্জিত হয় একাধিক প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর উঠতি বড়লোক জে রয় ঃ কি কাজে তোমাকে দেব তাই ভাবছি—'দুর্ভাবনার কারণ নেই আপনার; এনি জব নাও ইস গুড ইনাফ ফমি; য়্যাম সিম্পলি স্ট্র্যাণ্ডেড—! ভেরি গুড!—নিজের উরুতে দারুণ জোরে চাপড় মারে যজ্ঞেশ্বর ঃ তুমি আমার মেয়েকে পড়াবে; আমারই বাড়িতে থাকবে এবং খাবে; প্লাস আমি যাদেব তোমায় তা তোমার ইংরেজি

উচ্চারণের অনুপযুক্ত বা অমর্যাদাকর হবে না ; অফকোর্স এ পসিসন যদি তোমার নিতে না আপত্তি থাকে—

লাফিয়ে ওঠে চামেলী বড়ুয়ার হৃৎপিণ্ড গলার কাছে ; সে এই সুযোগই চাইছিলো। যজ্ঞেশ্বরের গাড়ির ভেতরে একবার সিধোতে পারলে কেঁচো খুড়তে সাপ না বেরোক কাঁকড়া বিছে যে বেরুবে এবিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েই চামেলী হাত বাড়িয়ে দিলো যজ্ঞেশ্বরের দিকে ; হাতের ওপর ঈষৎ চাপ দিয়ে বল্লে ঃ একসেপ্ট ইট উইথ প্লেসার—।

রোমাঞ্চিত হয় জে রায়। মনে পড়ে যায় কোথায় যেন পড়েছিলো মনে রাখার মত জোক ঃ মুখে বলে না কিছু। তাকায় চামেলীর দিকে আরেকবার। যৌবনের ফুলঝুরি তারা কাটছে সামনে বসে। মুক্তোর মত সাদা দাঁতে ঝকঝক করছে আজকের রাত। তাকিয়েই নিজের হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়া জোকের ওপর সংশোধন ক'রে।

যজ্ঞেশ্বরের বাড়িতে গিয়ে ওঠে আশাকা মল্লিক ওরফে চামেলী বড়ুয়া। কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝতে পারে শশিকলা যে এ কেবল তার মেয়ের প্রাইভেট টুটর নয় ; আরও কিছু প্রাইভেট ব্যাপার আছে এর ; এবং সে উদ্দেশ্য মহৎ নয় মোটেই। কয়েকদিনের মধ্যেই সত্য হয় আশঙ্কা ; আশঙ্কার চেয়ে অনেকখানি বেশি সত্য হয়ে দেখা দেয়। নিজের স্বামীর চরম মাতাল হয়ে শশীকে মারপিট করার দুর্দিনেও যা হয়নি তাই হয়। শয্যা নেয় অসুরের শরীর নিয়ে একদিন যে এসেছিলো এ সংসারে ; সে কত বছর আগে মনে পড়ে না আজ শয্যাশায়ী শশিকলার ; স্মৃতির ধূসর পাণ্ডুলিপির অক্ষর যতবার পড়তে চায় ততবার মুছে যায় চোখের জলে ; ঝাপসা হয়ে যায় শতেক খোয়ারের মধ্যেও নিষ্কলঙ্ক সংসারের লক্ষ্মীশ্রীর প্রোফিল।

পাঁচ

চামেলী বড়ুয়ার অশোকা মল্লিক হয়ে যজ্ঞেশ্বরের বাড়িতে প্রবেশের ফল ফলতে দেরী হলো না খুব বেশি। যজ্ঞেশ্বর রায় যে রাতে স্বর্ণদেব সরকারকে চায়ের সঙ্গে বিষ দিয়ে হত্যা করে তার লাস বাড়িসংলগ্ন খোলা জায়গায় পুঁতে ফেলে [যে মাঠের ওপর নতুন বাড়ি তুলেছে হঠাৎ বড়লোক যজ্ঞেশ্বর], সেই রাতের শেষ দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলো অনেক বেলা পর্যন্ত। ভোরবেলায় ছেলে-মেয়ে নীচে নেমে এসে পেরেকে ঝোলানো স্বর্ণদেবের একটা টুপি দেখতে পায়। টুপিটা ভেলভেটের ; চমৎকার দেখতে সবুজ রং-এর। তুজনেরই দারুণ লোভ হয় টুপিটা মাথায় দেবার; মাথায় দিয়ে দেখে অনেক সাইজ বড়ো। তবুও লোভ ছাড়তে পারে না টুপির! লুকিয়ে ফেলে সেটাকে। স্বর্ণদেব আবার বাড়িতে আসবে যখন বাবার আড়ালে মায়ের হাত দিয়ে ফেরৎ দেবে। এই ঠিক হয়। কিন্তু স্বর্ণদেব যখন আর আসে না ; এবং তাদের নাবালক কানেও শেষ পর্যন্ত একথা এসে পৌছয় যখন বড়দের কথার ফাঁকে ফোঁকরে যে স্বর্ণদেবকে কেউ মেরে অথবা গুম করে ফেলেছে তখন তারা ভয় পেয়ে গিয়ে ভীষণ তুজনেই টুপির ব্যাপারটা চেপে যায় বেমালুম। চামেলী এবাড়িতে এসে জোটার অল্পদিন পরেই বাইরে থেকে ছুটিতে বাড়ি আসে যজ্ঞেশ্বরের ছেলে। এবং প্রত্যেকবারের মতই ভাইবোনে মিলে টুপিটা মাথায় দিয়ে দেখে আর কতদিনে তাদের মাথার খাপে খাপে বসে যাবে সেটা অবিকল। চামেলী আসবার পর সেবারেও যথারীতি তারা একদিন যখন স্বর্ণদেবের ফেল্ট হ্যাট নিয়ে মাথায় পরে দেখছে তখন ঘরের মধ্যে ঢুকে পরে চামেলী। টুপিটা দেখেই তার বুকের মধ্যে উত্তেজনার হাতুড়ি পড়তে থাকে।

চামেলীকে দেখে ভয় পেয়ে যায় যজ্ঞেশ্বর রায়ের ছেলেমেয়ে দুজনেই। মুখ মড়ার মতো সাদা হয়ে গেছে ভাইবোনের। টুপিটা নিয়ে চামেলী তাদের অভয় দেয়ঃ কোনও ভয় নেই; কেউ জানবে না তারপর পেটের সমস্ত কথা বার করে নিয়ে আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করে না চামেলী। সোজা যায় লালবাজারে; হরিপদ দাশ শর্মার কাছে ফেলে দেয় টুপিটা। দিয়ে জানায় সে স্বর্ণদেবের এই ফেল্ট হ্যাট এবং এটি উদ্ধার হয়েছে যজ্ঞেশ্বরের বাড়ি থেকেই। এবিষয়ে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই যে স্বর্ণদেবের নিরুদ্দেশ হবার রহস্য আত্মগোপন করে আছে যজ্ঞেশ্বর রায়ের বাড়িতেই; আর কোথাও নয়।

এমন সময় সেপাই এসে কার্ড দেয়।

কার্ডখানা হাতে নিয়ে হরিপদ জিজ্ঞেস করেন চামেলীকেঃ 'যজ্ঞেশ্বর জানে ?—না,—জবাব করে চামেলীঃ এখনও কাকপক্ষী জানেনা; এখনই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারলে আনওয়্যার যজ্ঞেশ্বর সময় পাবে না এলিবাই বানাবার; কনফেস করে ফেলবে সব—উত্তেজনায় হাঁফাতে থাকে চামেলী। কিন্তু উত্তেজনার এতটুকু উত্তাপ পাওয়া যায় না হরিপদর কণ্ঠে। বিলো ফ্রিজিং পয়েণ্ট স্বরে হরিপদ বলেনঃ যজ্ঞেশ্বর জানে। চামেলী একটু জোরের সঙ্গে জিজ্ঞেস করেঃ কি বলছেন ? 'এই দেখো,—বলে হরিপদ বাড়িয়ে দেয় কার্ডখানা; কার্ডে লেখা জ্বলজ্বলে অক্ষরেঃ জে রয়।

যজ্ঞেশ্বর এসে ঢোকে সেই মুহূর্তেই। একা নয়। যাকে নিয়ে ঢোকে তাকে দেখে চীৎকার করে ওঠে চামেলী। তার সামনে। হরিপদর সামনে, দিনের আলোয় যজ্ঞেশ্বরের পাশে যে জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে,—সে আর কেউ নয়,—এমামলা যার নিহত অথবা নিরুদ্দেশ হওয়া নিয়েঃ—স্বয়ং স্বর্ণদেব সরকার দাঁড়িয়ে চামেলীর সামনে।

চামেলী অবাক হলো; স্বর্ণদেব তাকে যেন চেনেই না; তাকে যেন দেখেইনি কখনও।

যজ্ঞেশ্বর জানায় যে সেদিন সকালেই মাত্র স্বর্ণদেব সরকারকে সে দেখে সেণ্ট্াল এভেনিউতে দাঁড়িয়ে আছে। যে স্টুপরে তার বাড়িতে ঝড়ের রাতে ট্যাক্সিতে বেরিয়ে আর হোটেলে ফিরে যেতে পারেনি স্বর্ণদেব অবিকল সেই এক পোষাকে দেখে তাকে যজ্ঞেশ্বর। কিন্তু যজ্ঞেশ্বরকে দেখে চিনতে পারে না একেবারেই! অল্পক্ষণ কথা বলেই বুঝতে পারে অবশ্য যজ্ঞেশ্বর যে সম্পুর্ণ স্মৃতি বিভ্রম হয়েছে স্বর্ণদেবের ইংরেজিতে যে অসুখের নাম এ্যামনেশিয়া; দারুণ ভয় অথবা নিদারুণ আঘাতে এই রোগ হয় যার ফলে সে তার অতীত সম্পূর্ণ ভুলে যায়। কখনও-কখনও অনুরূপ জোরালো আঘাতে আবার জেগে ওঠে পূর্বস্মৃতি। যজ্ঞেশ্বর একথাও জানাতে ভোলে না যে অবিকল সেই পোষাকেই দণ্ডায়মান থাকলেও স্বর্ণদেবের মাথায় সেই ঝড়ের রাতে যে ফেল্ট টুপি দেখেছিলো গাঢ় সবুজ রংএর সেইটেই কেবল ছিলো না।

হরিপদ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্বর্ণদেবকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করেন: এই যে সেই স্বর্ণদেব তাহলে তা প্রমাণ করবার উপায় কি? তড়াক করে লাফিয়ে উঠে চামেলী এগিয়ে আসে টুপিটা নিয়ে। বলে: প্রমাণ আমার হাতেই অছে—।

লোকটার মাথায় টুপিটা বসে এমন অনায়াসে এমন খাপে খাপে যে সন্দেহ প্রকাশ করবার জন্যে তদান্তীন্তন বিচক্ষণতম পুলিস কর্মচারী হরিপদদাশ শর্মা লজ্জিত হয়।

যজ্ঞেশ্বরের মুখ উজ্জ্বল হয়, চামেলীর চোখে বেদনার ছায়া নামে! কেবল যাকে নিয়ে এত কাণ্ড তার মুখে ঘটেনা বিন্দুমাত্র ভাবান্তর।

পাথরের মূর্তির মতো বসে থাকে সে; কথা পর্যন্ত বলে না একটাও।

॥ যবনিকা পতন ॥

এতক্ষণ একনাগাড়ে বলে যাচ্ছিলো স্বর্ণদেব সরকার মামলার ইতিবৃত্ত ট্যাক্সি চালাতে চালাতে অর্জুন সিং। এতক্ষণে তাকে আমি প্রথম বাধা দিই ঃ তুমি গল্পের আরম্ভে একবার শেষে একটু আগেও আরেকবার বলেছ যে স্বর্ণদেব প্রথম যেদিন ঝড়ের রাতে যজ্ঞেশ্বর রায়ের ঠিকানায় যায় সেই রাতেই যজ্ঞেশ্বর তাকে টাকার জন্যে চায়ের কাপে তার বিষ মিশিয়ে দিয়ে হত্যা করে; বলো নি? অর্জুন সিং যেমন চালে এতক্ষণ গল্প বলছিলো কেমন নির্লিপ্ত প্রথম শ্রেণীর গল্প বলার নিরুত্তেজ আবেগহীনতায় উত্তর দেয়ঃ বলেছি; তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে? রেগে যাই আমি এবারে। যে ভুল এত সোজা যে আঙুল দিয়ে কাউকে দেখাতে হলে নিজের ওপরই ঘেন্না হয় সেই রকম ভুল করবার পর অর্জুনের নির্লজ্জতায় আমার কুপিত কণ্ঠস্বর প্রশ্ন করে ঃ যে মারা গেছে বিষ খাবার ফলে তাকে আবার যজ্ঞেশ্বর সঙ্গে করে নিয়ে লালবাজারে যায় কি করে?

আপনি রাগ করেছেন তাই দেখতে পাচ্ছেন না আমার গল্পে কোথাও গাঁজা বা উল্টোপাল্টা কিছু নেই, আমি যে ঘটনা এতক্ষণ আপনাকে বলেছি তা সত্য ঘটনা; জীবনের টুকরো। বাঙলা ছবিতেও প্রথম দৃশ্যে কাউকে মেরে ফেলে আবার বাঁচানোর হাস্যকর নমুনা এখনও পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে বলে শুনিনি; কাজেই জীবনের ছবিতে এমন অসঙ্গতি অসম্ভব। যাক; আপনি রাগ না করলে আমার বলবার প্রয়োজন হতো না; আপনি বুঝতে পারতেন যে যে-লোকটিকে স্বর্ণদেব সরকার লালবাজারে হাজির করে হরিপদ-চামেলীর সামনে সে স্বর্ণদেব সরকারের মতো অবিকল দেখতে; কিন্তু স্বর্ণদেব সরকার নয়—

আরও রাগ বাড়ে আমার এমন সহজ ব্যাপারটা চোখে না পড়ায়। আমার কণ্ঠস্বরে রাগ পড়তে চায় না তখনও : সে স্বর্ণদেব না হলে ধরা পড়তে কতক্ষণ লাগবে ?

অর্জুন সিং : বহুদিন। কোনও দিনই ধরা পড়বে কি না বলা শক্ত—

আমি : কেন ?

অঃ সিং : কারণ, যজ্ঞেশ্বর তার স্মৃতিবিভ্রম রোগ হয়েছে বলে সাজানোর ফলে—

আ : অ ? এই লোকটি তাহলে আসলে কে ?

অঃ সিং : আসলে যে-ই হোক ; স্বর্ণদেব সরকার নয়। একে সেণ্ট্রাল এভেন্যুতেই সত্যি সত্যি একদিন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই যজ্ঞেশ্বরের মাথায় তাকে স্বর্ণদেব সরকার বলে খাড়া করে দেবার, মতলব খেলে ; ওই সঙ্গে এ্যামনেশিয়া অথবা স্মৃতিভ্রষ্টতার অজুহাতে সে চিরকাল দুধেভাতে রাজ্য এবং রাজকন্যা সমেত সুখে কাটাতে পারবে এই আশা দিয়ে লোকটিকেও রাজি করায় স্বর্ণদেব সরকার সাজতে—

আ : যজ্ঞেশ্বরর কি হয়—

আঃ সিংঃ একটি মানুষকে হত্যা করবার পরও কিছু হয় না ;— কিন্তু যতদিন যায় তত বিবেকের দংশনে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে সে। শশিকলা,—স্বামীর অন্য স্ত্রীলোকে আসক্তির কারণে আত্মহত্যা করে ; ছবি ডেভেলাপ এবং প্রিণ্ট করবার ঘরে রাখা যে তীব্র.বিষ দিয়ে যজ্ঞেশ্বর একদিন স্বর্ণদেবকে হত্যা করেছিলো তাই খেয়েই সব জ্বালা জুড়োয়। ছেলেমেয়ে পরিত্যাগ করে বাপকে মায়ের আত্মহত্যার আসল কারণ জ্ঞান করে ; পুলিশ মামলার কিনারা করতে পারে না ; স্বর্ণদেব সরকার বলে যাকে খাড়া করে যজ্ঞেশ্বর তাকে নিয়ে চামেলী ফিরে যায় সিঙ্গাপুরে—

আ : যজ্ঞেশ্বর এখন কোথায় ?

অ: সিং: যজ্ঞেশ্বর এখন ট্যাক্সি চালায়;—ট্যাক্সির নম্বর আপনার সবচেয়ে জানা—

আ: মানে?

অ: সিং: যজ্ঞেশ্বর, স্বর্ণদেবের মতো অবিকল দেখতে যাকে সেন্ট্রালএভেন্যুতে হঠাৎ পেয়ে যায় তারই নাম অর্জুন সিং!

আ: তোমার নাম তাহলে?

অ: সিং: আমার নামই যজ্ঞেশ্বর রায়! পৃথিবীতে এই প্রথম একজনকে হত্যা করে এবং নিজের স্ত্রীর আত্মহত্যার কারণ হয়েও যার কোনও শাস্তি হয়নি,—আমিই সেই হতভাগ্য যজ্ঞেশ্বর রায়; আমাকে দয়া করে পুলিশে দিন—

কি করব ভেবে পাচ্ছি না। পুলিশ ডাকব না সবটাই অর্জুন সিং-এর বানানো গল্প বুঝতে পারছি না সে মুহূর্তে। অর্জুন সিং তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে; গাড়ি নিয়ে সে নিজেই ঢুকছে লালবাজারে। আমার চোখ গিয়ে পড়েছে যেখানে সেখানে না তাকিয়েও দেখি; দেখতে পাই—

ট্যাক্সির মিটার উঠছে।